দুনিয়া কাঁপানো ভূতের গল্প

অনীশ দাস অপু



সূচিপত্র

উৎসর্গ

শতাব্দী জাহিদকে
আমি অনেক সময় কথা দিয়ে
কথা রাখতে পারি না বলে
আমার উপর খুব বিরক্ত হয়
কিন্তু কখনো তা মুখে প্রকাশ করে না!

.

ভূমিকা

বইয়ের নাম দেখেই অনুমান করা যাচ্ছে এতে কি ধরনের গল্প আছে। এ বইয়ে যাদের গল্প রয়েছে তারা প্রায় সকলেই বিশ্বখ্যাত হরর রাইটার। প্রচুর ভালো ভালো ভূতের গল্প লিখেছেন তাঁরা। সেসব গল্প থেকে সেরা গল্পটি বাছাই করা খুবই দুঃসাধ্য কাজ। তবু আমি চেষ্টা করেছি এ সংকলনে এ লেখকদের খুব ভালো গল্প দিতে।

এডগার অ্যালান পোর যে দুটি গল্প এখানে দেওয়া হয়েছে তা তাঁর সেরা ভৌতিক গল্পগুলোর মধ্যে সেরা। গাই প্রেস্টনের গা ছমছমে সরাইখানার ভূত-এর বিষয়েও আমার একই ধারণা! রোজমেরি টিম্পারলির ক্রিসমাস মিটিং তাঁর সবচেয়ে সাড়া জাগানো ভূতের গল্প। রাসকিন বন্ড প্রচুর ভূতের গল্প লিখেছেন। বানরের প্রতিশোধ তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। গি দ্য মোপাসাঁর লাশ এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। লাফসাডিও হিয়ার্ন জগদবিখ্যাত হয়ে আছেন চাইনিজ এবং জাপানি ভূতের গল্প লিখে। তাঁর দারুণ একটি জাপানি ভৌতিক গল্প এ বইতে সন্নিবেশিত হলো। আলজারনন ব্ল্যাকউডের সেরা একটি ভূতের গল্প এ সংকলনে দেওয়া হলো। আশা করি সবকটা গল্পই কিশোর পাঠকদের মুগ্ধ ও চমকিত করবে!

অনীশ দাস অপু

এক ভয়ংকর রাত – লাফকাডিও হিয়ার্ন

অনেক অনেক দিন আগে জাপানের ছোট একটি গায়ে বাস করত এক গরিব চাষা এবং তার বউ। তারা দুজনেই ছিল বেজায় ভালোমানুষ। তাদের অনেকগুলো বাচ্চা। ফলে এতগুলো মানুষের ভরণপোষণ করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠে যেত চাষার। বড় ছেলেটির বয়স যখন চৌদ্দ, গায়ে-গতরে বেশ বলিষ্ঠ, সে বাপকে কৃষিকাজে সাহায্য করতে নেমে পড়ল। আর ছোট মেয়েগুলো হাঁটতে শেখার পরপরই মাকে ঘরকন্নার কাজে সহযোগিতা করতে লাগল।

তবে চাষি-দম্পতির সবচেয়ে ছোট ছেলেটি কোনো শক্ত কাজ করতে পারত না। তার মাথায় ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি-সে তার সবকটা ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে চালাক ছিল। কিন্তু খুব দুর্বল শরীর এবং দেখতে নিতান্তই ছোটখাটো ছিল বলে লোকে বলত ওকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কোনো কাজেই লাগবে না সে। বাবা-মা ভাবল কৃষিকাজের মতো কাজ করা যেহেতু ছোট ছেলের পক্ষে সম্ভব নয় কাজেই ওকে পুরোহিতের কাজে লাগিয়ে দেওয়া যাক। বাবা-মা একদিন ছোট ছেলেকে নিয়ে গায়ের মন্দিরে চলে এল। বুড়ো পুরোহিতকে অনুনয় করল, তিনি যেন তাদের ছেলেটিকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ওকে পড়ালেখা শেখান। যাতে বড় হয়ে সে মন্দিরে যজমানি (পুরোহিতগিরি) করতে পারে।

বৃদ্ধ ছোট ছেলেটির সঙ্গে সদয় আচরণ করলেন। তাকে কিছু কঠিন প্রশ্ন করা হলো। ছেলেটি এমন চতুর জবাব দিল যে তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি করলেন না ধর্মগুরু। তিনি ওকে মন্দিরের টোলে ভর্তি করে দিলেন। ওখানে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো।

বৃদ্ধ পুরোহিত ছেলেটিকে যা শেখালেন, সবকিছু দ্রুত শিখে নিল সে। সে গুরুর অত্যন্ত বাধ্যগত ছাত্র। তবে তার একটা দোষ ছিল। সে পড়ার সময় ছবি আঁকত। এবং তার ছবির বিষয়বস্তু ছিল বেড়াল। ওই সময় মন্দিরে বেড়ালের ছবি আঁকার ব্যাপারে নিষেধ ছিল।

একা যখন থাকত ছেলেটি, তখনই এঁকে ফেলত বেড়ালের ছবি। সে ধর্মগুরুর ধর্মীয় বইয়ের মার্জিনে ছবি আঁকত, মন্দিরের সমস্ত পর্দা, দেয়াল এবং পিলারগুলো ভরে গিয়েছিল বেড়ালের ছবিতে। পুরোহিত বহুবার তাকে এসব ছবি আঁকতে মানা। করেছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছেলেটি ছবি আঁকত কারণ না এঁকে পারত না। ছবি না আঁকলে কেমন অস্থির লাগত তার। সে ছিল অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন। চিত্রকর। ছবি এঁকেই একদিন নাম কামানোর স্বপ্ন দেখত ছেলেটি। এ জন্য ধর্মশিক্ষায় মন দিতে পারত না। ভালো ছাত্র হবার খায়েশও তার ছিল না। ভালো। ছাত্র হতে হলে বই পড়তে হয়। কিন্তু পড়ার চেয়ে আঁকাআঁকিই তাকে টানত বেশি।

একদিন এক দেবতার পোশাকে বেড়ালের ছবি আঁকতে গিয়ে ধর্মগুরুর কাছে হাতেনাতে ধরা খেল ছেলেটি। বুড়ো খুবই রেগে গেলেন। বললেন, তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও। তুমি কোনো দিনও পুরোহিত হতে পারবে না। তবে চেষ্টা। করলে একদিন হয়তো বড় মাপের চিত্রকর হতে পারবে। তোমাকে শেষ একটি উপদেশ দিই শোনো। উপদেশটি কখনো ভুলো না। রাতের বেলা বড় জায়গা এড়িয়ে চলবে; ঘুমাবে ছোট জায়গায়!

গুরুর এ কথার মানে কিছুই বুঝতে পারল না ছেলেটি। এ কথার মানে ভাবতে ভাবতে সে তার ছোট বোঁচকা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মন্দির থেকে। গুরুকে তাঁর কথার অর্থ জিজ্ঞেস করার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ধমক খাওয়ার ভয়ে প্রশ্ন করল না। শুধু বিদায় বলতে পারল।

মনে দুঃখ নিয়ে মন্দির ছেড়েছে ছেলেটি। কোথায় যাবে, কী করবে বুঝতে পারছে না। যদি বাড়ি যায়, পুরোহিতের কথা না শোনার অভিযোগে বাপ ওকে বেদম পিটুনি দেবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বাড়ি যাওয়ার চিন্তা নাকচ করে দিল সে। হঠাৎ পাশের বাড়ির গাঁয়ের কথা মনে পড়ল। এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে। ওই গাঁয়ে বিশাল একটি মন্দির আছে। মন্দিরে তরুণ-বুড়ো অনেক পুরোহিত আছেন। ছেলেটি শুনেছে ওখানেও একটি টোল আছে। সেখানে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। সে ঠিক করল ওই গাঁয়ে যাবে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের হাতে পায়ে ধরে বসবে তাকে টোলে ভর্তি করানোর জন্য। ওর কাতর অনুরোধ নিশ্চয় ফেলতে পারবেন না পুরোহিত।

কিন্তু ছেলেটি জানত না বড় মন্দিরটি বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানে একটা পিশাচ এসে আস্তানা গেড়েছে। পিশাচের ভয়ে পুরোহিতরা অনেক আগেই মন্দির ছেড়ে পালিয়েছেন। গাঁয়ের কজন সাহসী মানুষ পিশাচটাকে মারতে গিয়েছিল। তারা এক রাতে ছিল ওই মন্দিরে। কিন্তু পরদিন কাউকে জীবিত পাওয়া যায়নি। তাদের রক্তাক্ত, খাবলানো শরীর পড়ে ছিল মন্দিরের চাতালে। তারপর থেকে ভুলেও কেউ ওই মন্দিরের ছায়া মাড়ায় না। পরিত্যক্ত মন্দিরটি এখন হানাবাড়িতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসব কথা তো আর ছেলেটি জানত না। সে মন্দিরের টোলে ভর্তি হওয়ার আশায় পথ চলতে লাগল।

চার ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে গায়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা নেমে এল। গ্রামের মানুষ এমনিতেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, মন্দিরে পিশাচের হামলা হওয়ার পর থেকে তারা সূর্য পশ্চিমে ডুব না দিতেই ঘরের দরজা এঁটে, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। আর মন্দির থেকে ভেসে আসা বিকট, বীভৎস সব চিৎকার শুনে শিউরে শিউরে ওঠে।

মন্দিরটি গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, একটি টিলার ওপরে। ছেলেটি মন্দিরে আলো জ্বলতে দেখল। ভুতুড়ে মন্দিরে কেউ পুজো দিতেই যায় না, আলো জ্বালা দূরে থাক। তবে লোকে বলে পিশাচটা নাকি সাঁঝবেলা আলো জ্বেলে রাখে পথ ভোলা পথচারীদের আকৃষ্ট করার জন্য। আলোর হাতছানিতে দূর গাঁ থেকে আসা মুসাফির আশ্রয়ের খোঁজে মন্দিরে ঢুকলেই পিশাচের শিকার হয়।

ছেলেটি মন্দিরের বিশাল, কারুকাজ করা পুরু কাঠের দরজার সামনে দাঁড়াল। আঙুলের গাঁট দিয়ে টুক টুক শব্দ করল। কেউ সাড়া দিল না। আবার নক করল সে। জবাব নেই। মন্দিরের সবাই এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! অবাক হয় ছেলেটি। একটু ইতস্তত করে দরজায় ধাক্কা দিল সে। ক্যাআআচ শব্দে মেলে গেল কপাট। ভেতরে ঢুকল ছেলেটি। মাটির একটি প্রদীপ জ্বলছে কেবল। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ছেলেটি ভাবল কেউ না কেউ নিশ্চয় আসবে। সে মেঝেতে বসে পড়ল। অপেক্ষা করছে। ছেলেটি লক্ষ করল মন্দিরের সবকিছুই ধুলোয় ধূসর হয়ে আছে। মাকড়সার জালে ছেয়ে গেছে প্রায় পুরোটা জায়গা। বোঝাই যায় অনেক দিন ঝাঁট পড়েনি। হয়তো ঝাঁট দেওয়ার লোক নেই। ছেলেটি মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠল পুরোহিত তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন ভেবে। কারণ ঘর ঝাঁট দেওয়ার জন্য হলেও তো ওদের একজন লোক লাগবে।

জানালায় বড় বড় পর্দা ঝুলতে দেখে খুশি হয়ে গেল ছেলেটি। বাহ্, ছবি আঁকার চমৎকার ক্যানভাস পাওয়া গেছে। রঙ-পেন্সিলের বাক্স সে সঙ্গেই নিয়ে এসেছে। দ্বিরুক্তি না করে বেড়ালের ছবি আঁকতে বসে গেল।

পর্দাগুলো ভরে ফেলল সে বড় বড় বেড়ালের ছবিতে। পথ চলার ক্লান্তিতে তার ঘুম এসে গেল। সে পুঁটুলি খুলে চাদর বিছিয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়ার তোড়জোর করছিল, এমন

সময় মনে পড়ে গেল ধর্মগুরুর কথা : রাতের বেলা বড় জায়গা এড়িয়ে চলবে; ঘুমাবে ছোট জায়গায়!

মন্দিরটি প্রকাণ্ড; আর সে একা। গুরুর কথাগুলো মনে পড়তে, অর্থ না বুঝলেও, এবার তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সে ঘুমানোর জন্য ছোট ঘর খুঁজতে লাগল। ক্ষুদ্র একটি কুঠুরিও পেয়ে গেল। কুঠুরির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। তারপর ছিটকিনি লাগিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল।

গভীর রাতে ভয়ংকর একটা শব্দে জেগে গেল সে। মারামারি করছে কারা যেন। ফাঁচর্য্যাচ, অপার্থিব আওয়াজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জান্তব চিৎকার। এমন ভয় পেল ছেলেটি, দরজার ফাঁক দিয়েও মন্দিরের ভেতরে তাকাতে সাহস পেল না। তার। কেবলই মনে হচ্ছিল তাকালেই এমন ভয়াবহ কিছু একটা সে দেখবে যে হার্টফেল হয়ে যাবে। সে মেঝেতে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল। নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে।

আলোর যে সূক্ষ্ম রেখা ঢুকছিল দরজার ছিলকা দিয়ে তা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেটি বুঝতে পারল নিভে গেছে মন্দিরের বাতি। নিকষ আঁধারে ডুবে গেল ঘর। তবে ভীতিকর শব্দগুলো চলল বিরতিহীন। ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসের আওয়াজ, রক্ত হিম করা গলায় কে যেন আর্তনাদ করে উঠছে মাঝে মাঝে। গোটা মন্দির থরথর করে কাঁপছে। বোঝা যাচ্ছে দরজার বাইরে মরণপণ লড়াইয়ে মেতে উঠেছে দুটি পক্ষ। অনেকক্ষণ পরে নেমে এল

নীরবতা। কিন্তু ছেলেটি ভয়ে নড়ল না এক চুল। অবশেষে ভোর হলো। সোনালি আলো দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে।

লুকানো জায়গা থেকে খুব সাবধানে বেরিয়ে এল ছেলেটি। তাকাল চারদিকে। দেখল মন্দিরের মেঝেতে রক্ত আর রক্ত! রক্তের পুকুরের মাঝখানে মরে পড়ে আছে গরুর চেয়েও আকারে বড় একটি দৈত্যকার ইঁদুর। মন্দিরের পিশাচ!

কিন্তু এটাকে হত্যা করল কে? মানুষজন কিংবা অন্য কোনো প্রাণী দেখা যাচ্ছে । হঠাৎ ছেলেটি লক্ষ করল সে গতরাতে পর্দায় যেসব বেড়ালের ছবি এঁকেছে, সবকটা বেড়ালের গায়ে রক্ত মাখা! সে তক্ষুনি বুঝতে পারল পিশাচ ইঁদুরটাকে তারই আঁকা বেড়ালরা হত্যা করেছে। এবং এখন সে বুঝতে পারল বৃদ্ধ পুরোহিতের সেই সাবধান বাণীর মানে- রাতের বেলা বড় জায়গা এড়িয়ে চলবে; ঘুমাবে ছোট জায়গায়।

ওই ছেলেটি বড় হয়ে খুব বিখ্যাত চিত্রকর হয়েছিল। আর তার আঁকা বেড়ালের সেই ছবিগুলো এখনো ওই মন্দিরে আছে!

কালো বিড়াল – এডগার অ্যালান পো

ছেলেবেলা থেকেই আমি পশুপাখি খুব ভালোবাসি। আমার স্বভাবও ছিল শান্ত। জন্তুজানোয়ার পুষতে ভীষণ ভালোবাসতাম। বড় হলাম কিন্তু স্বভাব পালটাল না।

বিয়ে করলাম অল্পবয়সে। বেশ মনের মতো বউ পেলাম। স্বভাবটি মিষ্টি। শান্ত। জন্তুজানোয়ার পোষার শখ আমার মতোই। আমাদের শখের চিড়িয়াখানায় একটা বেড়ালও ছিল। কালো বেড়াল।

শুধু কালো নয়, বেড়ালটা বেশ বড়ও বটে। বুদ্ধিও তেমনি। বেড়ালের মগজে যে এত বুদ্ধি ঠাসা থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বউ কিন্তু কথায় কথায় একটা কথা মনে করিয়ে দিত আমাকে। কালো বেড়ালকে নাকি ছদ্মবেশী ডাইনি মনে করা হতো সেকালে। আমি ওসব কুসংস্কারের ধার ধারতাম না।

বেড়ালটার নাম পুটো। অষ্টপ্রহর আমার সঙ্গে থাকত, পায়ে পায়ে ঘুরত, আমার হাতে খেত, আমার কাছে ঘুমোত। প্লুটোকে ছাড়া আমারও একদিন চলত না।

বেশ কয়েক বছর পুটোর সঙ্গে মাখামাখির পর আমার চরিত্রের অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা গেল।

ছিলাম ধীর, শান্ত। হয়ে উঠলাম অস্থির, অসহিষ্ণু, খিটখিটে। মেজাজ এমন তিরিক্ষি হয়ে উঠল যে বউকে ধরেও মারধর শুরু করলাম। প্লুটোকেও বাদ দিলাম না।

এক রাতে মদ খেয়ে বাড়ি এসে দেখি দুটো আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। আর যায় কোথা! মাথায় রক্ত উঠে গেল আমার। খপ করে চেপে ধরলাম। ফ্যাস করে সে কামড়ে দিল আমার হাতে। আমি রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম। পকেট থেকে ছুরি বার করে পুটোর টুটি ধরলাম এক হাতে, আরেক হাতে ধীরে সুস্থে উপড়ে আনলাম একটা চোখ।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙবার পর একটু অনুতাপ হলো বৈকি। উত্তেজনা মিলিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে কিন্তু দুটো আমার ছায়া মাড়ানো ছেড়ে দিল। চোখ সেরে উঠল দুদিনেই। কিন্তু আমাকে দেখলেই সরে যেত কালো ছায়ার মতো।

আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে পশু প্রবৃত্তি আবার জেগে উঠল। যে বেড়াল আমাকে এত ভালোবাসত, হঠাৎ আমার ওপর তার এত ঘৃণা আমার মনের মধ্যে শয়তানি প্রবৃত্তিকে খুঁচিয়ে তুলতে লাগল। সে কিন্তু কোনো দিন ক্ষতি করেনি আমার। তা সত্ত্বেও ওকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার জন্য হাত নিশপিশ করতে লাগল আমার।

একদিন সত্যি সত্যিই ফাঁসি দিলাম প্লুটোকে। বাগানের গাছে লটকে দিলাম দড়ির ফাঁসে। ও মারা গেল। আমিও কেঁদে ফেললাম। মন বলল, এর শাস্তি আমাকে পেতেই হবে।

সেই রাতেই আগুন লাগল বাড়িতে। রহস্যময় আগুন। জ্বলন্ত মশারি থেকে বউকে নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখলাম পুড়ছে সারা বাড়ি।

দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোটা বাড়ি। খাড়া রইল শুধু একতলার একটা দেয়াল। পাড়ার সবাই অবাক হয়ে গেল সাদা দেয়ালের ওপর একটা কালো ছাপ দেখে। ঠিক যেন একটা কালো বেড়াল। গলায় দড়ির ফাঁস।

একরাতেই ফকির হয়ে গেলাম আমি। কালো বেড়ালের স্মৃতি ভোলার জন্য আবার একটা বেড়ালের খোঁজে ঘুরতে লাগলাম সমাজের নিচুতলায়। একদিন একটা মদের আড্ডায় দেখতে পেলাম এমনি একটা বেড়াল। বসেছিল পিপের ওপর-অথচ একটু আগেও জায়গাটা শূন্য ছিল। অবিকল প্লটোর মতোই বড়, মিশমিশে কালো। শুধু বুক ছাড়া। সেখানটা ধবধবে সাদা।

বেড়ালটার মালিকের সন্ধান পেলাম না। তবে আমি গায়ে হাত দিতেই যেন আদরে গলে গেল সে। বাড়ি নিয়ে আসার পরের দিন সকালবেলা লক্ষ করলাম-একটা চোখ নেই।

সেই কারণেই আরও বেশি করে আমার বউ ভালোবেসে ফেলল নতুন বেড়ালকে। মনটা ওর নরম। মমতায় ভরা-তাই।

যা ভেবেছিলাম, আমার ক্ষেত্রে ঘটল কিন্তু তার উল্টো। ভালোবাসা দূরের কথা-দিনকে দিন মনের মধ্যে ক্রোধ আর ঘৃণা জমা হতে লাগল নতুন বেড়ালের প্রতি। কোত্থেকে যে এত হিংসা-বিদ্বেষ রাগ মনে এল বলতে পারব না।

বেড়ালটার আদেখলেপনাও বাড়ল তালে তাল মিলিয়ে। যতই মাথায় খুন চাপতে লাগল আমার ওর প্রতি-ততই আমার গায়ে মাথায় কোলে চাপার বহর বেড়ে গেল হতভাগার। প্রতিবারেই ভাবতাম, দিই শেষ করে। সামলে নিতাম অতি কষ্টে।

বউ কিন্তু একটা জিনিসের প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত আমার। তা হলো কালো বেড়ালের সাদা বুক। প্লটোর সঙ্গে তফাত শুধু ঐ জায়গায়। সাদা ছোপটা দেখতে অবিকল ফাঁসির দড়ির মতো!

একদিন পুরোনো বাড়ির পাতাল ঘরে গেছি বউকে নিয়ে। অভাবের তাড়নায় গিয়ে পারতাম না। ন্যাওটা বেড়ালটা পায়ে পায়ে আসছে। পায়ে পা বেঁধে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম নিজেকে। কিন্তু সামলাতে পারলাম না মেজাজ। ধা করে একটা কুড়াল তুলে নিয়ে টিপ করলাম হতচ্ছাড়া বেড়ালের মাথা-বাধা দিল আমার বউ।

বউ বাধা না দিলে সেদিনই দফারফা হয়ে যেত নতুন বেড়ালের। কিন্তু সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বউয়ের ওপর। অমানুষিক রাগ। কুড়ালটা মাথার ওপরে তুলে বসিয়ে দিলাম ওর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল স্ত্রী।

সমস্যা হলো লাশটা নিয়ে। অনেক ভেবেচিন্তে দেয়ালের মধ্যে রক্তমাখা দেহটা খাড়া করে দাঁড় করিয়ে ইট দিয়ে গেঁথে ফেললাম। প্লাস্টার করে দিলাম। বাইরে থেকে ধরবার কোনো উপায় রইল না।

বড় শান্তিতে ঘুমালাম সেরাত্রে-বেড়াল ছাড়া। কুড়াল নিয়ে খুঁজে ছিলাম তাকে বধ করবার জন্য-পাইনি।

দিন কয়েক পরে পুলিশ এসে সারা বাড়ি খুঁজল। আমি সঙ্গে রইলাম। একটুও বুক কাঁপল না। চার-চারবার নিয়ে গেলাম পাতালকুঠুরির সেই দেয়ালের কাছে।

তারপর যখন মুখ চুন করে ওরা চলে যাচ্ছে, বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়লাম আমি। হাতের পাটি দিয়ে খটাস করে মারলাম দেয়ালের ঠিক সেইখানে যেখানে নিজের হাতে কবর দিয়েছি বউকে।

.

আচমকা একটা বিকট কান্নার আওয়াজ ভেসে এল ভেতর থেকে। সারা বাড়ি গমগম করতে লাগল সেই আওয়াজে। দেখলাম, আমার মরা বউয়ের মাথার ওপর বসে রয়েছে সেই কালো বেড়ালটা-যার বুকের কাছটা সাদা!

ক্রিসমাস মিটিং – রোজমেরি টিম্পারলি

আমি আগে কখনো একাকী কাটাইনি ক্রিসমাস।

সাজানো গোছানো কামরায় একা একা বসে থাকতে আমার গা কেমন ছমছম করে। মাথায় যত রাজ্যের ভূত-প্রেতের চিন্তা এসে ভিড় করে, মনে হয় রুমের মধ্যে কারা যেন কথা বলছে। অতীতকাল থেকে আসা মানুষজন। কেমন দম বন্ধ করা একটা অনুভূতি হয় আমার-ফেলে আসা সবকটা ক্রিসমাসের স্মৃতি জট পাকিয়ে যায় মনের মধ্যে : শিশুতোষ ক্রিসমাস, বাড়িভর্তি আত্মীয়স্বজন, জানালার ধারে গাছ, পুডিংয়ের মধ্যে পুরে রাখা ছয় পেন্সের মুদ্রা এবং কালো আকাশঘেরা সকালের ক্রিসমাস; কৈশোরের ক্রিসমাস, বাবা-মায়ের সঙ্গে। যুদ্ধ, হাড় কাঁপানো শীত। দেশের বাইরে থেকে আসা চিঠিপত্র; বড় হয়ে ওঠার পরের ক্রিসমাস; প্রেমিকের সঙ্গে-তুষারপাত, জাদুকরি মোহ, রেড ওয়াইন, চুম্বন এবং মাঝরাতের আগে অন্ধকার রাস্তায় হাঁটাহাঁটি, বরফ পড়ে ধবধবে সাদা জমিন, কালো আকাশের পটভূমে ফুটে থাকা নক্ষত্রের হীরক দীপ্তি-কত কত ক্রিসমাসের স্মৃতি বছর ঘুরে।

আর এবারই প্রথম আমার একলা ক্রিসমাস কাটানো।

তবে শুধু একাকিত্বই যে অনুভব করি তা নয়। আরও অনেক লোকই একা একা ক্রিসমাস কাটায়-তাদের সঙ্গে এক ধরনের একাত্মতা অনুভূত হয় মনে। এদের সংখ্যা লক্ষাধিক-তারা অতীত এবং বর্তমানের মানুষ। এরকম একটা অনুভূতি জাগে, চোখ বুজলে মনে হয় অতীত বলে কিছু নেই, ভবিষ্যতের কোনো অস্তিত্ব নেই, শুধু রয়েছে সীমাহীন বর্তমান যার নাম সময় আর এ সময়টুকুই কেবল আমাদের হাতে আছে।

তবু আপনি যতই উন্নাসিক হোন না কেন, কিংবা ধর্মকর্মে আপনার আগ্রহ নাই-বা থাকুক, ক্রিসমাসের সময় একা থাকলে আপনার কাছে অদ্ভুতই লাগবে।

কাজেই যখন যুবকটিকে আমি দেখলাম ভেতরে ঢুকতে, মনে বেশ স্বস্তি লাগল। তবে এর মধ্যে রোমান্টিক ব্যাপার কিছু নেই-আমি পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই এক নারী, চিরকুমারী স্কুলশিক্ষিকা, গম্ভীর, মাথাভর্তি কালো চুল, এক সময়ের সুন্দর চক্ষুজোড়া এখন ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন আর যুবকের বয়স কুড়ির কোঠায়, একটু অন্যরকম পোশাক গায়ে, গলায় ওয়াইন কালারের টাই এবং কালো ভেলভেট জ্যাকেট, মাথার বাদামি চুলে কতদিন নাপিতের কাচি পড়েনি কে জানে! তার নীল, সরু চোখজোড়ায় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, খাড়া নাক, উদ্ধত চিবুক। তবে খুব একটা শক্তিশালী কাঠামো তার নয়। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা।

সে দরজায় কড়া না নেড়েই ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল : দুঃখিত। ভেবেছিলাম এটা আমার কামরা। বেরিয়ে যাচ্ছিল, কী মনে করে থমকে গিয়ে ইতস্তত গলায় জানতে চাইল, আপনি কি একা?

হ্যাঁ।

এটা-ব্যাপারটা অদ্ভুত। মানে ক্রিসমাস একাকী কাটানো, তাই না? আমি কি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

নিশ্চয় পারো।

সে এসে আগুনের ধারে বসল।

আশা করি আপনি ভাবছেন না আমি কোনো মতলব নিয়ে এখানে এসেছি। আমি সত্যি ভেবেছিলাম এটা আমার রুম, ব্যাখ্যা দিল সে।

তুমি ভুল করেছ বলে আমি খুশি। কিন্তু তোমার এত তরুণের তো ক্রিসমাসের সময় একা থাকার কথা নয়।

আমি দেশে যেতে পারিনি আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। তাহলে আমার কাজের ক্ষতি হতো। আমি একজন লেখক।

ও আচ্ছা, আমার মুখে হাসি এসে গেল। এরকম অস্বাভাবিক পোশাকের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেল আর এ তরুণটি দেখছি নিজের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। তা তো বটেই, লেখালেখির মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমি চোখ মটকে বললাম।

না, একটি মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু আমার পরিবার বিষয়টি বুঝতে চায় না। তারা কোনটা জরুরি তা-ই জানে না।

সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে পরিবারের সহায়তা পাওয়া যায় খুব কম।

পাওয়া যায় না বললেই চলে, গম্ভীর গলায় বলল যুবক।

তুমি কী লিখছ?

কবিতা এবং ডায়েরি একযোগে। নাম রেখেছি মাই পোয়েমস অ্যান্ড আই। লেখক ফ্রান্সিস ব্যান্ডেল। এটাই আমার নাম। আমার পরিবার বলে লেখালেখি করে কোনো লাভ নেই। বিশেষ করে এত কম বয়সে। কিন্তু নিজেকে আমি কম বয়সী বলে ভাবি না।

মাঝেমধ্যে নিজেকে বয়োবৃদ্ধ বলে মনে হয়। মনে হয়। অনেক কাজ বাকি থাকতেই না আবার মরে যাই।

সৃজনশীলের চাকায় দ্রুত গতি আনতে হবে।

ঠিক তাই। আপনি আসল কথাটি বুঝতে পেরেছেন! আপনি একদিন আমার লেখা পড়বেন। দয়া করে অবশ্যই পড়বেন! তার কণ্ঠে মরিয়ার সুর, চাউনিতে ভয় দেখে আমি বললাম :

ক্রিসমাসের দিনে আমরা বড্ড বেশি নিরানন্দ আচরণ করছি। তোমার জন্য একটু কফি বানিয়ে আনি? আমি কেক খাব।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। কফি চড়িয়ে দিলাম পারকোলেটরে। তবে আমার কথায় বোধহয় আঘাত পেয়েছিল ছেলেটি, ফিরে এসে দেখি সে চলে গেছে। আমি যারপরনাই হতাশ হলাম।

কফি বানিয়ে রুমটির বইয়ের তাকে চোখ বুলাতে লাগলাম। মোটা মোটা বইয়ের ভলিউম। বাড়িউলি এজন্য আগেই আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলেছিলেন : আশা করি বইপত্রে আপনার বিরাগ নেই, মিস। আমার স্বামী এগুলো ছুঁয়েও দেখেন না আর

বইগুলো রাখবার জায়গাও পাচ্ছি না। এ কারণে এ কামরার ভাড়া আমরা একটু কম নিই।

বইতে আমার বিরাগ নেই, বললাম আমি। বই বরং আমার ভালো বন্ধু।

কিন্তু এ বইগুলোর চেহারাসুরত তেমন বন্ধুসুলভ মনে হচ্ছে না। আমি হাতের কাছে যা পেলাম তা-ই একখানা তুলে নিলাম। নাকি নিয়তিই আমাকে ওই বইটি তুলে নিতে বাধ্য করেছে?

কফিতে চুমুক দিতে দিতে আর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আমি জীর্ণ চেহারার পাতলা বইটি পড়তে লাগলাম। এটির প্রকাশনাকাল ১৮৫২ সালের বসন্ত। মূলত কবিতার বই- কাঁচা হাতের লেখা তবে পরিচ্ছন্ন। তারপর দেখি ডায়েরির ঢঙে কিছু লেখাও রয়েছে। কৌতূহল নিয়ে ওতে চোখ বুলালাম। শুরুতেই লেখা ক্রিসমাস, ১৮৫১। আমি পড়তে লাগলাম :

আমার প্রথম ক্রিসমাস দিনটি কাটল একাকী। তবে আমার একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে। হাঁটাহাঁটি শেষে আমি যখন আমার লজিং হাউজে ফিরেছি, এক মধ্যবয়স্ক মহিলাকে দেখতে পেলাম। প্রথমে ভেবেছি বোধহয় ভুল করে ভুল কামরায় প্রবেশ করেছি। কিন্তু তা নয়। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে হঠাৎ তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার মনে হয় উনি ভূত ছিলেন। তবে আমি ভয় পাইনি। ওনাকে আমার

বেশ পছন্দ হয়েছিল। তবে আজ রাতে আমার শরীরটা কেন জানি ভালো লাগছে না। একদমই ভালো লাগছে না। এর আগে কোনো দিন ক্রিসমাসের সময় আমি অসুস্থ হইনি।

বইয়ের শেষ পাতায় প্রকাশকের একটি নোট রয়েছে :

ফ্রান্সিস র‍্যান্ডেল **১৮৫১** খ্রিষ্টাব্দের ক্রিসমাসের রাতে আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন। এ বইতে যে ভদ্রমহিলার কথা বলা হয়েছে তিনিই ওকে সর্বশেষ জীবিত দেখেন। তাঁকে সামনে আসার আহ্বান জানালেও তিনি কোনো দিনই তা করেননি। তার পরিচয় রহস্যই রয়ে গেছে।

ঘুম – এডগার অ্যালান পো

মঁসিয়ে ভালডিমারের অস্বাভাবিক কেস রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল কেন, সে বিষয়ে অবাক হওয়ার ভান দেখানোর আর কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। পুরো ব্যাপারটাকেই বলা যায় অলৌকিক ব্যাপার। সাময়িকভাবে বিষয়টা জনসমক্ষে আনা হবে না, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আরও কিছু গবেষণা করার জন্য, যাতে অত্যাশ্চর্য ঘটনাটায় কিছু আলোকপাত করা যায়-বিচিত্র প্রহেলিকাকে প্রাঞ্জল করা যায়। কিন্তু গোপন করতে গিয়ে এমন কানাঘুষা শুরু হয়ে গিয়েছিল যে আসল ব্যাপারটা পাঁচজনের কানে না পৌঁছে, পৌঁছেছিল ডালাপালা মেলে ছড়িয়ে পড়া

অতিরঞ্জিত এক বিবরণ। ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল সমাজের নানা মহলে এবং স্বভাবতই অবিশ্বাস আর বিদ্রুপের বন্যা বয়ে গিয়েছিল হাটেবাজারে।

ঠিক যা ঘটেছিল, তা নিবেদন করা সঙ্গত মনে করি এই কারণেই। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই

গত তিন বছর ধরে মেসমেরিজম বিদ্যায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম আমি। নয় মাস আগে হঠাৎ খেয়াল হলো পরপর এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সত্ত্বেও একটা বিষয় বরাবরই বাদ পড়ে

গেছে। বিষয়টা রীতিমত অত্যাশ্চর্য তো বটেই, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার কূল-কিনারাও পাওয়া যায় না।

জ্যান্ত মানুষকে সম্মোহন করার চেষ্টা তো কেউ করেনি। যে মানুষটা মরতে চলেছে, তাকে যদি মেসমেরাইজ করা যায়, মরে যাওয়ার পর ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়-সেটা দেখাও তো দরকার। এমনও তো হতে পারে যে সম্মোহন করে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব?

এ ধরনের উদ্ভট এক্সপেরিমেন্টে নামবার আগে অনেকগুলো পয়েন্ট বিবেচনা করা দরকার। তার মধ্যে মূল পয়েন্ট তিনটে : প্রথম, মৃত্যুও মুহূর্তে চৌম্বক প্রভাব মানুষটার ওপর কার্যকর হয় কিনা; দ্বিতীয়, যদি কার্যকর হয়, তবে আসন্ন মৃত্যু সম্মোহনের প্রভাবকে বাড়িয়ে দেয়, না কমিয়ে দেয়; তৃতীয়, কতদিন যমরাজকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব।

শেষের পয়েন্টটাই কিন্তু আমাকে নাড়া দিল সবচেয়ে বেশি। অস্থির হয়ে গেলাম কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য।

কিন্তু কাকে নিয়ে অভিনব এই এক্সপেরিমেন্টে নামা যায়? মনে পড়ল বন্ধুবর মঁসিয়ে আরটেস্ট ভালডিমারের কথা। বিবলিথিকা ফরেনসিকা বইটা লিখে যিনি যথেষ্ট নাম করেছেন এবং ছদ্মনামে লিখেছেন ইস্‌সাছার মার্ক্স। তার লেখা গর্গনচুয়া আর ওয়ালেন্সটাইন বই দুখানির নামও কারও অজানা নয়। মঁসিয়ে ভালডিমার ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে থাকেন নিউইয়র্কের হারলেম অঞ্চলে। চেহারায়। বাড়াবাড়ির ছিটেফোঁটাও নেই।

শরীরের নীচের দিকটা জন র‍্যানডর্ফের নিম্নাঙ্গের মতো। চুল মিশমিশে কালো-কিন্তু জুলফি ধবধবে সাদা। ফলে অনেকেরই ধারণা চুলটা আসল নয়-নকল; মানে পরচুলা। অত্যন্ত নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ। সম্মোহনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আদর্শ ব্যক্তি। বার দুই-তিন তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে ছিলাম অতি সহজেই-বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু নাকাল করে ছেড়েছিলেন বেশ কয়েকবার। ভদ্রলোকের ধাতটা এমনই অদ্ভুত যে আগেই আন্দাজ করা যায় না ঠিক কি ঘটতে পারে। কখনোই ওঁর ইচ্ছাশক্তি পুরোপুরি কজায় আনতে পারিনি। আমরা যাকে বলি ক্লেয়ারভয়্যান্স-সোজা কথায় যাকে বলে অলোকদৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি-এই ব্যাপারটিতে ওঁর ওপর আস্থা রাখা যায়নি কোনো দিনই। ব্যর্থতার কারণ হিসেবে অবশ্য আমি দায়ী করেছি তার স্বাস্থ্যের টলমল অবস্থাকে-কখন যে ভালো আছেন, আর কখন যে কাহিল হচ্ছেন-তার কোনো ঠিক নেই। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার মাসকয়েক আগে ডাক্তাররা একবাক্যে রায় দিয়েছিলেন, রোগটা দুরারোগ্য-থাইসিস। মরতে হবেই জেনে উনি কিন্তু বিচলিত হননি। মৃত্যুকে প্রশান্ত মনে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

উদ্ভট আইডিয়াটা মাথায় আসতে এই সব কারণেই মঁসিয়ে ভালডিমারের কথাটাই মনে এল সবার আগে। ওঁর মনের চেহারা আমার অজানা নয়-আমার অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে বাধা দিতে যাবেন না। আমেরিকায় ওঁর কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই যে বাগড়া দিতে আসবে। তাই প্রসঙ্গটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করলাম ভদ্রলোকের সঙ্গে। অবাক হলাম তাঁর আগ্রহ আর উত্তেজনা দেখে। অবাক হওয়ার কারণ আছে বইকি। আমার সম্মোহনের খপ্পরে বারবার নিজেকে সঁপে দিয়েও সম্মোহনের বিদ্যেটা নিয়ে

কস্মিনকালেও গদগদ হননি ভালডিমার। ব্যাধিটা এমনই যে মৃত্যু কবে হবে কখন হবে তা যখন সঠিকভাবে হিসাব করে বলে দেওয়া সম্ভব নয় তখন উনি বললেন, ডাক্তাররা যখনই বলে যাবে মৃত্যুর দিন আর সময়, তার ঠিক চব্বিশ ঘন্টা আগে উনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

মাস সাতেক আগে ভালডিমারের স্বহস্তে লেখা এই চিঠিটি পেলাম :

মাই ডিয়ার পি–

স্বচ্ছন্দে এখন আসতে পারেন। কাল মাঝরাত পর্যন্ত আমার আয়ু-বলে। গেলেন দুজন ডাক্তার। সময় হয়েছে। চলে আসুন।

ভালডিমার

চিঠি লেখার আধঘণ্টা পর চিঠি পৌঁছোলো আমার হাতে, তার ঠিক পনেরো মিনিট পর আমি পৌঁছোলাম মুমূর্ষ মানুষটার শয্যার পাশে। দিন দশেক তাঁকে দেখিনি। কিন্তু দশ দিনেই চেহারার হাল যা হয়েছে, আঁতকে ওঠার মতো। মুখ সিসের মতো বিবর্ণ; চোখ একেবারেই নিষ্প্রভ; এতটাই ক্ষীণকায় হয়ে গেছেন যে গালের চামড়া কুঁড়ে যেন হনু বেরিয়ে আসতে চাইছে। অবিরল শ্লেষ্ম বেরোচ্ছে। নাক-মুখ দিয়ে। নাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। তা সত্ত্বেও অটুট মনোবল আর শেষ দৈহিক শক্তিকে আঁকড়ে থাকার ফলে

টিকে আছেন এখনো। চাঙ্গা হওয়ার। জন্য নিজেই ওষুধ নিয়ে খেলেন। ঘরে যখন ঢুকলাম, দেখলাম পকেটবুকে কি লিখছেন। কথা বললেন সুস্পষ্ট স্বরে। দুপাশে দাঁড়িয়ে দুই ডাক্তার। বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন ভালডিমার কোনোমতে পিঠ সোজা করে।

ডাক্তার দুজনকে আড়ালে ডেকে এনে শুনে নিলাম বন্ধুবরের শরীরের অবস্থা। বাঁদিকের ফুসফুস গত আঠারো মাস ধরে শক্ত হয়ে এসেছে এবং এখন তা একেবারেই অকেজো। ডানদিকের ফুসফুসের ওপরের অংশের অবস্থাও তাই। নিচের দিকটা দগদগে হয়ে রয়েছে অসংখ্য ক্ষতে। কয়েক জায়গায় ফুসফুস একেবারেই ফুটো হয়ে গেছে এবং পাঁজরার সঙ্গে আটকে রয়েছে। ডানদিকের এই অবস্থা ঘটেছে সম্প্রতি। ফুসফুস শক্ত হয়েছে খুবই তাড়াতাড়ি-অস্বাভাবিক গতিবেগে। একমাস আগেও লক্ষণ ধরা পড়েনি। ফুসফুস যে পাঁজরার সঙ্গে লেগে রয়েছে, এটা ধরা পড়েছে মাত্র তিন দিন আগে। থাইসিস ছাড়াও হৃদ্যন্ত্রের মূল ধমনীও নিশ্চয় বিগড়েছে-যদিও তা যাচাই করে দেখা এখন আর সম্ভব নয়। কেননা, ভালডিমার মারা যাবেন রবিবার রাত বারোটা নাগাদ। একথা হলো শনিবার সন্ধ্যে সাতটার সময়ে।

ডাক্তারদের বললাম, পরের দিন রাত দশটা নাগাদ যেন রোগীর বিছানার পাশে হাজির থাকেন। বিদায় নিলেন দুই ডাক্তার। ভালডিমারের পাশে বসলাম। শরীরের বর্তমান অবস্থা আর আসন্ন এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করলাম। ঐরকম শোচনীয় অবস্থাতেও ওঁর আগ্রহ তিলমাত্র কমেনি দেখে অবাক হলাম। তাড়া লাগালেন সময় নষ্ট না করে তক্ষুনি যেন শুরু করে দিই এক্সপেরিমেন্ট। দুজন নার্স ছিল ঘরে। কিন্তু

নির্ভরযোগ্য সাক্ষী সামনে না রেখে কাজ শুরু করতে মন চাইল না। দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ? তাই বললাম, এক্সপেরিমেন্ট শুরু হবে পরের দিন রাত আটটা নাগাদ। আটটার সময়ে একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্টকে রাখব ঘরের মধ্যে। ছোকরার নাম থিওডোরের। ডাক্তাররা না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই ভালো হতো। কিন্তু ভালডিমারের পীড়াপীড়িতে আর তার শারীরিক অবস্থা দেখে বেশি দেরি করতে চাইলাম না।

মি. এল যা দেখেছিলেন এবং যা শুনেছিলেন-সব হুবহু লিখে নিয়েছিলেন। তাঁর সেই লেখা থেকেই এই প্রতিবেদন হাজির করছি আপনাদের সামনে।

পরের দিন আটটার সময়ে ভালডিমারের হাত ধরে জিজ্ঞেস করলাম–যতদুর পারেন, স্পষ্টভাবে বলুন মি. এল-এর সামনে এই এক্সপেরিমেন্টে আপনার সায় আছে কিনা।

ক্ষীণ কিন্তু সুস্পষ্ট স্বরে উনি বললেন–হ্যাঁ, আমি সম্মোহিত হতে চাই এক্ষুনি। অনেক দেরি করে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম হস্তচালান-যেভাবে এর আগে ওঁকে ঘুম পাড়িয়েছি বহুবার-ঠিক সেইভাবে। কপালে দু-একবার টোকা দিতেই শুরু হয়ে গেল সম্মোহনের প্রভাব। কিন্তু দশটা নাগাদ ডাক্তার দুজন এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত সেরকম ফল পেলান না। ডাক্তারদেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওঁদের কোনো আপত্তি আছে কিনা। ওঁরা বললেন, রোগীর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে-এখন অনায়াসেই সম্মোহনের ঝুঁকি

নেওয়া চলে। আমি তখন হাত চালালাম নিচের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম ভালডিমারের ডানচোখের দিকে।

ওঁর নাড়ি তখন অতিশয় ক্ষীণ, আধমিনিট অন্তর নিশ্বাস ফেলছেন অতিকষ্টে।

পনেরো মিনিট অব্যাহত রইল এই অবস্থা। তারপর গভীর শ্বাস ফেললেন ভালডিমার। নিশ্বাসের কষ্ট আর রইল না-কিন্তু আধমিনিটের ব্যবধানটা থেকেই গেল। হাত-পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে এল।

এগারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে প্রকৃত সম্মোহনের মোক্ষম লক্ষণগুলো প্রকাশ পেল। ঘুমের ঘোরে যারা হেঁটে বেড়ায়, তাদের চোখের সাদা অংশে যেরকম একটা ভাব ফুটে ওঠে, ঠিক সেইরকম ভাব প্রকাশ পেল তাঁর চোখে। দ্রুত হাত চালালাম বার কয়েক। থিরথির করে কেঁপে উঠে বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে জোরে জোরে আরও কয়েকবার হাত চালিয়ে এবং আমার ইচ্ছাশক্তিকে পুরোপুরি খাঁটিয়ে শক্ত এবং সহজ করে আনলাম ওঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। দু-পা দু-হাত সটান বিছানার ওপর মেলে ধরে মাথা ঈষৎ উঁচিয়ে স্থির হয়ে রইলেন ভালডিমার।

তখন মধ্যরাত্রি। ঘরে যারা ছিলেন, তাঁদেরকে বললাম ভালডিমারকে ভালোভাবে দেখে নিতে। প্রত্যেকেই একবাক্যে বললেন, উনি এখন পুরোপুরি সম্মোহিত। ডক্টর ডি অত্যন্ত

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন-সারা রাত থাকতে চাইলেন। ডক্টর এফ বলে গেলেন ভোর হলেই চলে আসবেন। মি. এল আর নার্স দুইজন রইলেন ঘরে।

রাত তিনটে পর্যন্ত ভালডিমারকে রেখে দিলাম একইভাবে। ডক্টর এফ বিদায় নেওয়ার সময়ে ওঁকে যেভাবে দেখে গিয়েছিলেন, তখনো হুবহু সেইভাবেই। নাকের সামনে আয়না ধরলে শুধু বোঝা যাচ্ছে নিশ্বাস পড়ছে। চোখ বন্ধ, হাত-পা মার্বেল পাথরের মতো শক্ত আর ঠান্ডা। কিন্তু মৃত্যুর লক্ষণ নেই শরীরের কোথাও। ভালডিমারকে এর আগে সম্মোহিত অবস্থায় রেখে একটা ব্যাপারে পুরোপুরি সফল হইনি কখনোই। ডান বাহুর ওপর হাত চালিয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আমার হাত নাড়ার অনুকরণে তাঁর হাত নাড়াতে পারিনি! মৃতবৎ ভালডিমারের ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা আবার করলাম-ব্যর্থ হব জেনেই করলাম। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। আশ্চর্যভাবে সফল হওয়ায়। আমার হাত যেদিকে যেদিকে গেল, ওঁর হাতও নড়তে লাগল সেই দিকে।

জিজ্ঞেস করলাম, সিয়ে ভালডিমার, আপনি কি ঘুমোচ্ছেন? উনি জবাব দিলেন না। কিন্তু থিরথির করে কেঁপে উঠল ঠোঁটজোড়া। পরপর তিনবার জিজ্ঞেস করলাম একই প্রশ্ন। তৃতীয় বারে ওঁর চোখের পাতা খুলে গেল। শিথিলভাবে নড়ে উঠল ঠোঁট এবং দুঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অতি অস্পষ্ট ফিসফিসানির মতো ভেসে এল

হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছি। জাগাবেন না! মরতে দিন এইভাবেই!

হাত আর পা দেখলাম আগের মতোই শক্ত অথচ আমি হাত নাড়ালেই উনি ডানহাত একইভাবে নাড়াচ্ছেন।

প্রশ্ন করলাম, বুকে ব্যথা এখনো অনুভব করছেন?

জবাবটা এল তক্ষুনি, তবে আগের চাইতে আরও অস্পষ্টভাবে, কোনো ব্যথা নেই-আমি মারা যাচ্ছি!

ভোরের দিকে এফ না আসা পর্যন্ত ভালডিমারকে আর ঘাটালাম না। রোগী এখনো বেঁচে আছে দেখে উনি তো স্তম্ভিত। নাড়ি টিপে এবং ঠোঁটের কাছে আয়না ধরে পরখ করে নিয়ে আমাকে বললেন প্রশ্ন চালিয়ে যেতে।

আগের মতোই মিনিট কয়েক ভালডিমার কোনো জবাব দিলেন না। মনে হলো, শক্তি সঞ্চয় করছেন। পরপর চারবার একই প্রশ্ন করলাম। চতুর্থবারে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন

হ্যাঁ, এখনো ঘুমিয়ে আছি-মারা যাচ্ছি।

ডাক্তাররা বললেন, ভালডিমারের এই প্রশান্ত অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হোক মৃত্যু না আসা পর্যন্ত। মৃত্যুর নাকি আর দেরি নেই, বড়জোর আর কয়েক মিনিট।

আগের প্রশ্নটাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম ভালডিমারকে।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল মুখাবয়বে। চক্ষুগোলক আস্তে আস্তে ঘুরে উঠে গেল ওপর দিকে, চোখের তারা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই কারণেই; বিবর্ণ হয়ে গেল চামড়া-সাদা কাগজের মতো; দুই হনুর ওপর জ্বরভাবযুক্ত উত্তপ্ত চক্রাকার দাগ দুটো নিভে গেল আচমকা। নিভে গেল শব্দ দুটো ব্যবহার করলাম। বিশেষ কারণে। মনে হলো, ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হলো জ্বলন্ত মোমবাতি। এতক্ষণ দাঁত ঢাকা ছিল ওপরের ঠোঁট ঝুলে থাকায় অকস্মাৎ কাঁপতে কাঁপতে ওপরের ঠোঁট ওপর দিকে গুটিয়ে যাওয়ায় প্রকট হলো দাঁতের সারি-ঝপাৎ করে নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ায় বেরিয়ে পড়ল ফুটে ওঠা কালচে জিভ। ঘরে যারা উপস্থিত ছিলেন, মৃত্যু দেখে তাঁরা অভ্যস্ত। তা সত্ত্বেও ভালডিমারের ঐ ভয়ানক মুখচ্ছবি দেখে সভয়ে সিঁটিয়ে খাটের পাশে পেছিয়ে গেলেন প্রত্যেকেই।

জানি পাঠকের মনে অবিশ্বাস দানা বাঁধছে। তা সত্ত্বেও যা ঘটেছিল, হুবহু তা বলে যাব।

ভালডিমারের সারা অঙ্গে প্রাণের আর কোনো লক্ষণ না দেখে আমরা ধরে নিলাম উনি মারা গেছেন। নার্সদের তদবিরের ওপরে তাকে ছেড়ে দেওয়াই ঠিক করলাম সবার মত নিয়ে। ঠিক তক্ষুনি ভীষণভাবে কেঁপে উঠল তার জিভ। কাঁপতে লাগল পুরো এক মিনিট ধরে। তারপর হাঁ হয়ে থাকা নিথর চোয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল এমন ভয়ানক

এক কণ্ঠস্বর যার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে বাতুলতা। শব্দটা কর্কশ, ভাঙা ভাঙা এবং শূন্যগর্ভ। বীভৎস। মানুষের কান কখনো এরকম বিকট শব্দ শোনেনি। দুটো কারণে তা অপার্থিব-অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। প্রথম, শব্দটা যেন ভেসে এল বহুদূর থেকে, পাতাল থেকে। দ্বিতীয়টি, আঠালো বস্তুর মতো চটচটে ছিল ওই শব্দ।

শব্দ আর কণ্ঠস্বর-এর কথাই কেবল বললাম। আরও একটু খুলে বলা যাক। আওয়াজটা আশ্চর্য রকমের রোমাঞ্চকর স্পষ্ট শব্দাংশ। মিনিট কয়েক আগে ভালডিমারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি এখনো ঘুমাচ্ছেন কিনা। উনি তার জবাব দিলেন এইভাবে

হ্যাঁ;–না-ঘুমিয়েছিলাম-এখন-এখন মারা গেছি।

গায়ের লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল শব্দটার বীভৎস উচ্চারণে; শব্দ যে এরকম লোমহর্ষকভাবে উচ্চারিত হতে পারে, এরকম থেমে থেমে মেপে মেপে জিভ দিয়ে বেরোতে পারে-অতি বড় দুঃস্বপ্নেও কেউ তা কল্পনা করতে পারবেন না। সুতরাং, গায়ে কাঁটা যে দিয়েছিল তা অস্বীকার করার জো নেই। এক কথায় শব্দটা উচ্চারিত হওয়ার মতো নয় একেবারেই-কিন্তু তবুও তা ভয়াল অনুকম্পন তুলে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঠিকরে এসেছিল জিভ দিয়ে যেন কবরের অন্ধকার থেকে। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট মি. এল অজ্ঞান হয়ে গেলেন। নার্স দুজন দৌড়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুতেই আর তাদেরকে ফিরিয়ে আনা যায়নি। আমার অবস্থাটা যে কিরকম দাঁড়িয়েছিল সেই মুহূর্তে, পাঠকের কাছে তা ধোঁয়াটে রাখতে চাই না। বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছিল বললেই চলে।

ঘণ্টাখানেক কারও মুখে আর একটা শব্দও বেরোয়নি। একনাগাড়ে মি. এল-এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে গেছি। উনি জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর কথাবার্তা শুরু হলো ভালডিমারের অবস্থা নিয়ে।

অবস্থার বর্ণনা আগে যা দিয়েছিলাম, দেখা গেল তার রদবদল হয়নি-ভালডিমার রয়েছেন ঠিক একইভাবে। আয়না ধরলে নিশ্বাসের লক্ষণ আর ধরা পড়ছে না-তফাত শুধু এইখানে। বাহু থেকে রক্ত টেনে বার করার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। আমার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বাহু আর নাড়াতেও পারছিলাম না। সম্মোহনের ভাব দেখা যাচ্ছিল কেবল ভালডিমারের জিভে। যতবার প্রশ্ন করেছি, ততবার জিভ থরথর করে কেঁপে উঠেছে, যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে জবাব দেওয়ার-কিন্তু স্বর ফুটছে না। আমি ছাড়া অন্যরা প্রশ্ন করে ব্যর্থ হয়েছেন, এমনকি যুগ্ম-সম্মোহনের প্রভাবেও অন্যকে দিয়ে প্রশ্ন করে ফল পাইনি-ভালডিমারের জিভ নিথর থেকেছে। অন্য নার্সদের জুটিয়ে এনে তাদের জিম্মায় ভালডিমারকে রেখে দশটার সময়ে ডাক্তার দুজন আর মি. এলকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

বিকেলের দিকে আবার সবাই এলাম রোগীকে দেখতে। অবস্থা আগের মতোই। আবার ওঁকে জাগানোর চেষ্টা কওে কোনো লাভ নেই, এ বিষয়ে একমত হলাম প্রত্যেকেই। পরিষ্কার দেখা গেল, মৃত্যু বলতে যা বোঝার সম্মোহনের প্রভাবে তাকে আটকে রাখা সম্ভব হয়েছে। এ অবস্থায় ওঁকে ফের জাগাতে গেলে মৃত্যু ত্বরান্বিত হবে।

সেদিন থেকে গত সপ্তাহ পর্যন্ত, ঝাড়া সাত মাস একইভাবে পড়ে থেকেছেন ভালডিমার। ডাক্তার এবং অন্যান্যদের নিয়ে দেখে এসেছি মাঝে মাঝে। নার্সদের তদবিরে ছেদ পড়েনি মুহূর্তের জন্যেও।

গত শুক্রবার ঠিক করলাম, আবার ওঁকে জাগানোর চেষ্টা করা যাক। সর্বশেষ এই এক্সপেরিমেন্টের ফল শুভ হয়নি এবং এ নিয়েই যত কিছু কানাঘুষার সূচনা ঘটেছিল আড়ালে আবডালে।

সম্মোহনী প্রক্রিয়ার বিধিমত হস্তচালনা করে বেশ কিছুক্ষণ বিফল হলাম। তারপর দেখা গেল কনীনিকা আস্তে আস্তে একটুখানি নামল নিচের দিকে। সেইসঙ্গে বিকট দুর্গন্ধময় হলদেটে রস বেরিয়ে এল নেমে আসা চোখের তারার আশপাশ দিয়ে।

চেষ্টা করলাম ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে ভালডিমারের বাহু আবার চালনা করা যায় কিনা। ব্যর্থ হলাম। ডক্টও এফ-এর ইচ্ছানুসারে তখন একটা প্রশ্ন করলাম :

মঁসিয়ে ভালডিমার, এই মুহূর্তে আপনার ইচ্ছে বা অনুভূতি কি ধরনের, বলতে পারবেন?

মুহূর্তের মধ্যে হনু দুটোর ওপর জ্বরতপ্ত চক্রাকার লোহিত আভা জেগে উঠল। থরথর করে কেঁপে উঠল জিভ-যেন ভীষণভাবে ঘুরপাক খেতে লাগল হাঁ করা মুখগহ্বরের মধ্যে। চোয়াল আর ঠোঁট আগের মতোই আড়ষ্ট ছিল বলে হাঁ হয়ে আছে মুখটা এই সাত

মাস। তার পরেই, বেশ কিছুক্ষণ পরে, কদাকার সেই স্বর ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে এল জিভ দিয়ে

ঈশ্বরের দোহাই! তাড়াতাড়ি করুন! তাড়াতাড়ি! হয়, ঘুম পাড়িয়ে দিন, না হয় জাগিয়ে দিন!–এক্ষুনি! এইমাত্র! আমি মারা গেছি!

ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ভালডিমারকে সুস্থ করবার চেষ্টা করলাম। ব্যর্থ হলাম একেবারেই। চেষ্টা করলাম জাগাতে। ইচ্ছাশক্তি সংহত করে ধস্তাধস্তি করে গেলাম বললেই চলে। লক্ষ করলাম, কাজ হচ্ছে। ভালডিমারের সম্মোহনের প্রভাব কেটে যাবে এখুনি। ঘরসুদ্ধ লোক সাগ্রহে চেয়ে রইলেন কি হয় দেখবার জন্য।

যা হয়েছিল, তা এমনই অসম্ভব কাণ্ড যা দেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে না। কোনো মানুষ।

দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছি আর শুনছি বিকট বীভৎস হাহাকার-মারা গেছি! মারা গেছি! কথাটা বেরোচ্ছে কিন্তু ঘুরপাক খাওয়া জিভ থেকে, ঠোঁট থেকে নয়। তারপরেই আচমকা আমার হাতের নিচেই পুরো দেহটা এক মিনিটের মধ্যে কুঁচকে, গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে খুঁড়িয়ে, একদম পচে গেল। বিছানাময় পড়ে রইল কেবল অতি জঘন্য এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় খানিকটা জলীয় পদার্থ।

দাঁত – নুট হ্যামসুন

ছোটবেলায় আমি যে এলাকায় ছিলাম, সে এলাকার গির্জাটা ছিল একটা পাহাড়ের ওপর। মূল গির্জার চারপাশে পাঁচিলের মধ্যে ছিল অনেকটা ভোলা জায়গা। কোনো পাহারাদার ছিল না সেখানে। তাই যখন খুশি সেখানে যেতে পারতাম। গির্জায় নয়, যেতাম আমি সেই ভোলা জায়গাটায়, যেখানে ছিল অনেকগুলো কবর। আর কবরগুলোই ছিল আমার মূল আকর্ষণ। প্রতিটি কবর ছিল আমার চেনা। গির্জা এলাকার একদিকে ছিল এক সমাধিকক্ষ। সেখানে ছোট বড় নানা আকারের হাড় ছড়ানো ছিটানো থাকত। সেই সমাধিকক্ষেও আমি একা একা অনেকটা সময় কাটাতাম। আর হাড়গুলো নাড়াচাড়া করতাম।

একদিন সেই সমাধিকক্ষে একটি বিচিত্র দাঁত খুঁজে পেলাম। কিছু না ভেবেই ওটি আমি পকেটে ভরলাম। ভেবেছিলাম দাঁতটিতে কোনো নকশা করব। অদ্ভুত জিনিস জোগাড় করার শখ আছে আমার। আর সেটা যদি মৃত মানুষের কোনো অঙ্গের মধ্যে পড়ে তাহলে তো কথাই নেই।

তখন শরৎকাল। দাঁত নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। পড়ার ঘরে না গিয়ে আগে গেলাম রান্নাঘরে। বাতিটা জ্বালালাম না। বাতি জ্বালালেই পোকার উৎপাত হবে বলে। স্টোভটা জ্বালালাম। তাতে রান্নাঘরের অন্ধকার বাড়ল বৈ কমল না। স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে

একটা রেত দিয়ে দাঁতটা ঘষতে লাগলাম। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, এই স্বল্প আলোতে কাজ করা সম্ভব না। বড় চুলাটা জ্বালাতে হবে। রান্নাঘরের যেখানে কাঠ থাকে সেখানে গিয়ে এক টুকরা কাঠও দেখতে পেলাম না।

রান্নাঘরের পাশেই ছাউনি। শুকনো কাঠ ছাউনিতেই থাকে। ছাউনির ভিতর ঢুকলাম। ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। অন্যান্য দিন তো বাতি থাকে। আজ নেই কেন? অন্ধকারের মধ্যে এগোলাম। হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলো আমার চোখ একেবারে ধাধিয়ে দিল। ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম, কে, কে ওখানে? কোনো জবাব এল না। মনে মনে ভাবলাম, আমি হয়তো ভুল দেখেছি। সবটাই মনের ভুল। এই অন্ধকার ছাউনিতে আমি ছাড়া কেউ নেই।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কাঠের স্তূপের কাছে গেলাম। একটা কাঠ হাতে নিতেই কে যেন আমার মাথায় আঘাত করল। যা দিয়ে আঘাত করল তা বরফের মতো ঠান্ডা! মাথায় হাত দিলাম। এটাও কি মনের ভুল? আবার হাত দিলাম। না, নেই! ঠান্ডা জিনিসটা এখন আর নেই! তবে কি সিলিং থেকে আমার মাথায় কিছু পড়েছিল? কিন্তু সেই কিছু একটা কী? এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পেলাম না।

কাঠ নিয়ে রান্নাঘরে এলাম। বড় চুলাটা জ্বালালাম। পকেট থেকে দাঁতটা বের করে হাত রেত তুলে নিলাম। এইবার বেশ আলো হয়েছে। আরাম করে দাঁতটাকে ঘষা যাবে। দাঁতের ওপর রেতটা ধরলাম।

টুক-টুক-টুক! চমকে পিছনে তাকালাম। জানালায় একখানা বীভৎস মুখ! এ পাড়ার সবাইকে তো আমি চিনি। এ তাহলে কে? মুখে লাল দাড়ি, গলায় লাল মাফ লার জড়ানো। মাথার টুপিটাও লাল! এমন বীভৎস চেহারা আগে কখনো দেখিনি। আমার দিকে স্থির তাকিয়ে লোকটা নিঃশব্দে হাসতে লাগল। কী ভয়ংকর সেই হাসি!

দারুণ আতঙ্কে আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। আমার হাত থেকে দাঁতটা টুক করে মেঝেতে পড়ে গেল। মানুষটাও তখন ধীরে ধীরে জানালা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হওয়ার আগে লোকটার উপরের পাটির দাঁতগুলোর দিকে চোখ পড়ল। দেখলাম ঠিক মাঝখানের দাঁত নেই একটা!

আমার শরীর কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। আর সামলাতে পারলাম না নিজেকে। রান্নাঘরের মেঝেতে ধপ করে বসে পড়লাম। অনেকক্ষণ ধরে আবোলতাবোল চিন্তা করলাম। হঠাৎ মনে হলো গির্জার যে জায়গাটায় দাঁতটা কুড়িয়ে পেয়েছি, সেখানে ওটা রেখে আসা উচিত। দাঁতটার জন্যই যত গণ্ডগোল হচ্ছে। কিন্তু রাতের বেলা একা একা গির্জায় ফিরে যাওয়ার সাহস হলো না।

এদিকে রান্নাঘরের আলো আঁধারির রহস্যময় পরিবেশে আমি একা! কেউ এল না আমাকে উদ্ধার করতে। আসবেই-বা কি করে, সবাই তো জানে আমি আমার পড়ার ঘরে পড়ছি। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। রান্নাঘরের

পিছনের দরজা খুলে বাইরে এলাম। দেখলাম যেখানে বাসন মাজা হয় সেখানে। দাড়িওয়ালা সেই লোকটা দাঁড়িয়ে। ফোকলা দাঁতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

লোকটাকে দেখে আর কোনো দিকে না তাকিয়ে দৌড় দিলাম গির্জার দিকে। গির্জার কাছে এসে হুঁশ হলো। এ আমি কি করলাম? এখন তো পিছিয়েও যাওয়া যাবে না। ভেতরে ঢুকলাম। কবরস্তানের কাছে যেতেই দেখলাম লাল দাড়িওয়ালা লোকটা একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে মাথাটা একটু নোয়ালো। যেন সমাধিভূমিতে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

লোকটাকে দেখে এবার আমার স্থির বিশ্বাস জন্মাল, লোকটা জীবিত কেউ না। প্রেত ধরনের কিছু যার আত্মার মুক্তি হয়নি। ওর আত্মার মুক্তির জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম। আমার প্রার্থনার পরও লোকটা (নাকি প্রেতটা) আমার দিকে তাকিয়ে সেই নিঃশব্দ, বীভৎস হাসিটা হাসতে লাগল।

আবার একটা প্রচণ্ড ভয়ের ঢেউ আমাকে ধাক্কা দিল। কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে দাঁতটা বের করে লোকটার দিকে ছুঁড়ে মেরেই দৌড় দিলাম। অন্ধকারের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরে এলাম। সদর দরজায় দমাদম ঘুষি মারতে লাগলাম। শব্দ শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এল। পরে ওদের কাছে শুনেছিলাম আমার চেহারা নাকি একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। আমাকে প্রায় চেনাই যাচ্ছিল না।

সেদিনের পর প্রেমূর্তির সঙ্গে আমার আরও অনেকবার দেখা হয়েছে। আমার জীবনটা একেবারে অতিষ্ট করে তুলেছিল প্রেতটা। মাঝে মাঝে মনে হতো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করি। অপঘাতে মরলে আমিও প্রেত হয়ে যাব। তখন প্রেত হয়েই প্রেতের মোকাবিলা করতে পারব।

প্রেমূর্তিটা যতবারই এসেছে ততবারই সে আমার দিকে তাকিয়ে বীভৎসভাবে হাসত। আর প্রতিবার হাসির সময় ওর দাঁতের ফাঁকটা আরও বিকটভাবে প্রকাশ পেত।

প্রেতটা শেষবার এসেছিল তিন বছর আগে। এখন আমি বড় হয়েছি। চাকরি করছি। এক বিকেলে বাইরে বেড়াতে যাব তাই জুতাটা কালি করার জন্য একটা চাকরকে ডাকলাম। আমার ডাক সম্ভবত সে শুনতে পায়নি। তাই দরজা খুললাম চাকরটিকে ডাকার উদ্দেশে।

দরজা খুলতেই দেখলাম প্রেতটা দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন আর ওকে ভয় পেলাম । বরং, খুব বিরক্ত হলাম ওকে দেখে। একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললাম, তুমি আবার আমাকে বিরক্ত করতে এসেছ? তুমি কি কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল প্রেতটা। তারপর বিরাট হাঁ করে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। তখনই দেখতে পেলাম তার উপরের দাঁতগুলোর মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। প্রেতটা ফিরে পেয়েছে তার উপরের পাটির হারানো দাঁত।

দাদিমা – এস, এইচ, বার্টন

জানি ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হবে না। তবু আমরা ওকে প্রত্যাখ্যান করতে পারব না।

সেসিলি ফ্রবিশার কথা বলতে বলতে তার স্বামীকে একখানা চিঠি এগিয়ে দিল। ওরা ওদের বিরাট এবং আরামদায়ক রান্নাঘরে নাশতার টেবিলে বসে কথা বলছে। ডাকপিয়নমাত্রই চিঠিটি দিয়ে গেল।

চিঠিটি তুমি নিজেই পড়ো, ফ্রেডেরিক, বলল ও। তাহলে বুঝতে পারবে বিষয়টি কত কঠিন। সুসান ব্লেকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কুড়ি বছরেরও বেশি। একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছি। তার মেয়ে যদি আমাদের সঙ্গে এসে থাকতে চায়, মানা করি কীভাবে?

জানি সুসান তোমার প্রিয় বান্ধবী। ওকে আমিও পছন্দ করি। কিন্তু ওর স্বামীটাকে আমার পছন্দ নয়। খুবই বাজে লোক। ওকে আমি বিশ্বাস করি না। নাকেমুখে মিথ্যা কথা বলে।

ওকে আমিও দেখতে পারি না। বিশ্বাস করার তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু টেরেন্স ব্লেক এখানে থাকতে আসছে না। সুসানও নয়। থাকতে আসছে ইসোবেল, ওদের মেয়ে। দয়া করে চিঠিটি পড়ো, ফ্রেডেরিক। তাহলেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এবং ওরা আসার ব্যাপারে আশা করি আমার সঙ্গে একমত হবে।

ফ্রেডেরিক ফ্রবিশার পড়তে শুরু করল সুসান ব্লেকের চিঠি। দীর্ঘপত্র হলেও সে বেশ মনোযোগেই পড়ল। সে তার স্ত্রীকে সাহায্য করতে চায়, যদি সম্ভব হয়।

সুসান পরিষ্কার ভাষায় তার সমস্যার কথা ব্যক্ত করেছে। তার স্বামী টেরেন্স কানাডায় একটি চাকরি পেয়েছে। ভালো বেতনের চাকরি। আর টাকাটা ওদের। দরকার। টেরেন্স ইতোমধ্যে কানাডা চলে গেছে। সুসান যত দ্রুত সম্ভব তার স্বামীর সঙ্গে যোগ দিতে চায়। কিন্তু ইসোবেল এখনো স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেনি। ওর বয়স মাত্র ষোলো। ওর মা চায় মেয়ে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত ইংল্যান্ডেই থাকুক। তারপর সে কানাডায় বাবা-মার কাছে চলে যাবে। সুসানের ইচ্ছে ইসোবেল তার স্কুলজীবন শেষ করার আগ পর্যন্ত ফ্রবিশার দম্পতির সঙ্গে থাকবে। সুসান এবং সেবিলের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের। সুসান অত্যন্ত খুশি হবে যদি সেসিলি আগামী বছর দুই ইসোবেলকে তাদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনার সুযোগ দেয়। সেসিলি রাজি না হলে সুসানের পক্ষে আর কানাডা যাওয়া সম্ভব হবে না। আর প্রকৃত বন্ধু বলতে সুসানের শুধু ফ্রবিশাররাই রয়েছে। ইসোবেলের দাদা দাদি মারা গেছেন। কাজেই ইসোবেলের যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই।

ফ্রেডেরিক ফ্রবিশার চিঠিটি ফিরিয়ে দিল তার স্ত্রীকে। ওর জন্য খারাপই লাগছে আমার, বলল সে।

আমারও, ফ্রেডেরিক। টেরেন্সের কাছে ওর যত দ্রুত সম্ভব চলে যাওয়া উচিত। টেরেন্স এই প্রথম একটা ভালো চাকরি পেয়েছে।

আর সুসান যদি টেরেন্সের কাছে না যায় টেরেন্স হয়তো তাহলে উল্টোপাল্টা কিছু একটা করে বসবে। ও চাকরিটা হারাবে, বলে দিলাম। ওর ওপর কোনো ভরসা নেই। ওর বউও ওকে বিশ্বাস করে না।

সেজন্য সুসান দায়ী নয়, বলল সেসিলি। ওই লোকটাকে বিশ্বাস করলে সুসানই ঠকবে! রাগত গলায় বলল ফ্রেডেরিক। আমাদের কাছে এ বাড়িটি বিক্রির সময় সে খুব একটা সতোর পরিচয় দেয়নি।

সে দশ বছর আগের কথা, স্বামীকে মনে করিয়ে দিল সেসিলি। আর আমরা এখানে ভালোই আছি।

ফ্রেডেরিক হাসল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। আমরা সবসময়ই ভালো ছিলাম, মাই ডিয়ার। আমরা যেকটি বাড়িতে ছিলাম কোথাও অসুখী ছিলাম না। এ বাড়িটি তো খুবই চমৎকার। কিন্তু টেরেন্স ব্লেক এ বাড়ি সম্পর্কে আমাদের কাছে একগাদা মিথ্যে বলে অনেকগুলো টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

হয়তো ওর মন খারাপ ছিল। হয়তো এ বাড়িটি সে বিক্রি করতেই চায়নি। এ বাড়িতে তার পরিবার বহু বছর থেকেছে। তার বাবা-মা-ইসোবেলের দাদা দাদি-এখানেই থাকতেন। ব্লেক পরিবার এ বাড়িতে একশো বছরের বেশি সময় ধরে বাস করেছে। কাজেই বাড়িটি সে বিক্রি করতে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক।

দোষটা তার। সংসারের প্রতি মনোযোগ ছিল না তার। বোকার মতো সমস্ত টাকা খরচ করে ফেলেছে। তাই বাধ্য হয়েছে এ বাড়ি বিক্রি করতে। এখানে থাকার এত সামর্থ্যই তার ছিল না।

সেসিলি চেয়ার ছাড়ল। স্বামীর কাছে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল।

টেরেন্স প্রসঙ্গ বাদ দাও। তুমি ওর ব্যাপারে যা বলেছ ঠিকই বলেছ। কিন্তু সুসানকে আমরা কী বলব সেটা বলো?

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল ফ্রেডেরিক ফ্রবিশার। তারপর ধীরে ধীরে বলল, তোমাকে তো বললামই, সেসিলি। সুসানের জন্য আমার খারাপ লাগছে। ওর জন্য আমি কিছু করতে চাই।

তাহলে কি চিঠি লিখে ওকে বলে দেব ইসোবেলকে এখানে পাঠিয়ে দিতে?

ঘড়ি দেখল ফ্রেডেরিক। দেরি হয়ে গেল, বলল সে। আধঘণ্টা আগেই কাজে বসার কথা ছিল। ঘুরল তার স্ত্রীর দিকে।

তুমি চাও মেয়েটা এখানে আসুক, তাই না? জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা ঝাঁকাল সেসিলি। হ্যাঁ, ফ্রেডেরিক। ইসোবেলকে দেখি না বহুদিন। মেয়েটি ভারি মিষ্টি ছিল। ও এলে মজাই হবে। শত হলেও ও আমাদের পারিবারিক বন্ধু।

হাসল ফ্রেড্রেরিক। তাহলে আজকেই চিঠি লিখে ফেলো, সেসিলি। ওকে আসতে বলে দাও। চেষ্টা করব ও যেন এখানে ভালো থাকে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে। হলঘরে ওর পায়ের আওয়াজ পেল সেসিলি। তারপর লাইব্রেরি ঘরের দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ। ও ওর নতুন বই লিখতে শুরু করেছে। লাঞ্চের আগে আর ওই ঘর থেকে বেরুচ্ছে না।

আশা করি ইসোবেল এলে ওর কাজকর্মে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না, আপন মনে বলল সেসিলি। বাড়িটি অনেক বড়, আমাদের সবার জন্যই এখানে প্রচুর জায়গা রয়েছে।

মাসখানেক বাদে, ডিসেম্বরের এক রাতে সেসিলি ফ্রবিশার তাদের হলঘরে একা দাঁড়িয়েছিল। তার স্বামী গাড়ি নিয়ে গেছে রেলস্টেশনে ইসোবেলকে নিয়ে আসতে।

হলঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলাল সেসিলি। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ঘরের সবকটা বাতি জ্বালানো। ইসোবেলকে স্বাগত জানাতে এ ব্যবস্থা। সে দোতলায় গেল দেখতে মেয়েটির বেডরুম ঠিকঠাক সাজানো রয়েছে কিনা।

নিচতলায় আসার পরে হঠাৎ ওর কেমন অসুস্থ বোধ হতে লাগল। বুকের মধ্যে দপদপ করছে কলজে, মাথাটায় কেমন ব্যথা ব্যথা লাগছে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটি চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল সেসিলি।

সেসিলি ফ্রবিশার, নিজেকে বলল ও। তুমি একটা নির্বোধ মহিলা। তুমি নার্ভাস হয়ে আছ। নার্ভাস কারণ ষোড়শী একটি মেয়ে তোমাদের সঙ্গে থাকতে আসছে। কী বোকা তুমি! তুমি কেন ভয় পাচ্ছ? তোমার একজন চমৎকার স্বামী আছে যে প্রচুর টাকা আয় করে। সে ভালো ভালো বই লেখে এবং হাজার হাজার পাঠক তা কেনে। তুমি একজন সুখী মানুষ। এখন চোখ বুজে ইসোবেল না আসা পর্যন্ত বিশ্রাম নাও।

আগুনের উত্তাপ এবং আরামদায়ক চেয়ারের নরম গদি একটু পরেই ওর চোখে ঘুম এনে দিল। ঘুমের মধ্যে ও একটা স্বপ্ন দেখল। সে হলঘর দেখতে পেল। দেখল চেয়ারে বসে ও ঘুমাচ্ছে। তারপর দেখল লাইব্রেরি ঘরের দরজা খুলে গেছে এবং এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল ওই ঘর থেকে। মহিলার পরনে লম্বা, কালো একটি ড্রেস। মাথার চুল পেকে সাদা। সে হেঁটে এগোল হলঘরে। দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের সামনে। ঘুরল ঘুমন্ত

মহিলাটি অর্থাৎ সেসিলির দিকে। সেসিলি বুঝতে পারল তার অদ্ভুত অতিথিটি এখন কথা বলবে।

না! আর্তনাদ করে উঠল সেসিলি। বোলো না! আমার সঙ্গে কথা বলো! আমি তোমার কথা শুনতে চাই না!

নিজের চিল্কারের শব্দে জেগে গেল সেসিলি। লাফ মেরে খাড়া হলো। হলঘর শূন্য। তারপর সদর দরজা খুলে গেল এবং একটি মেয়ের গলার স্বর ভেসে এল।

আমি রাস্তা চিনি। এখানে আমি একসময় থাকতাম, জানেনই তো। অন্ধকারেও এ বাড়ির আনাচেকানাচে আমি হেঁটে বেড়াতে পারব।

ফ্রেডেরিক এবং ইসোবেল এগিয়ে গেল সেসিলির দিকে। ফ্রেডেরিকের হাতে মেয়েটির সুটকেস। তার মুখ হাসি হাসি।

আমরা এসে গেছি, সেসিলি। ট্রেন আসতে অনেক দেরি হলো। আর বাইরেও ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে আজ। ইসোবেলকে ওর রুমে নিয়ে যাও। আমি ওর সুটকেস নিয়ে যাচ্ছি। তারপর একসঙ্গে ডিনার করব। বেশ খিদে পেয়েছে। ইসাবেলেরও নিশ্চয় খিদে লেগেছে।

ইসোবেল বেশ লম্বা, গায়ের রঙ তামাটে, রোগাপাতলা। চোখজোড়া উজ্জ্বল, ঝকঝকে। ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। বোধ করি উত্তেজিত।

মিসেস ফ্রবিশার, বলল সে। আমাকে আপনারা থাকতে দিচ্ছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। আমি আবার আমার বাড়িতে ফিরে এসেছি।

মেয়েটির বলার ভঙ্গি নম্র। জবাবে কিছু বলতে গিয়েও মুখে কোনো কথা জোগাল না সেসিলির। তার কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। নিজের বাড়িতেই অদ্ভুত লাগছে। বাড়িতে মেয়েটি মেহমান নাকি সে?

ইসোবেল হলঘরে একবার চোখ বুলাল। একদম বদলে গেছে সবকিছু। মন্তব্য করল সে। আপনি বাড়ির অনেক রদবদল ঘটিয়েছেন।

হ্যাঁ, আমরা– সেসিলিকে কথা শেষ করতে দিল না ইসোবেল। হ্যাঁ, বাড়িতে অনেক আলো এবং উত্তাপ। আমরা যখন এ বাড়িতে থাকতাম তখন হলঘরে কোনো ফায়ারপ্লেস ছিল না। আমরা সেই খরচটা চালাতে পারিনি। আপনাদের অনেক টাকা পয়সা, না?

না, বলল সেসিলি-নরম গলায় বলার চেষ্টা করছে–না, ইসাবেল, আমাদের অনেক টাকা পয়সা নেই। আমা

আমার জন্য কোন ঘরটি রেখেছেন? আবারও সে সেসিলির কথায় বাধা দিল।

তুমি বড় বেডরুমটিতে থাকবে। ওখান থেকে বাগান দেখা যায়। ভাবলাম তোমার হয়তো ওই ঘরটাই পছন্দ–

হ্যাঁ, ধন্যবাদ। দোতলার সামনের দিকের ওই বেডরুমটিতেই আমি সবসময় থাকতাম। আমার সঙ্গে আসতে হবে না। আমি ঘরটি চিনি।

সে দৌড়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। ফ্রেডেরিক হাতে সুটকেস নিয়ে মন্থর গতিতে গেল ওর পেছন পেছন। সেসিলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওদের প্রস্থান।

ফ্রেডেরিক হলঘরে ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী ফায়ারপ্লেসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেসিলির কাছে এলে সে ঘুরে দাঁড়াল।

আমি একটা মস্ত ভুল করে ফেললাম, ফ্রেডেরিক।

ওহ্, এত তাড়াতাড়ি এ কথা কী করে বলছ তুমি? আমরা চুপচাপ, নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও নার্ভাস লাগছিল ফ্রেডেরিকের। তার গলার স্বর এমন নামানো যে স্বামীর কথা প্রায় শুনতেই পেল না সেসিলি।

এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। সেসিলি আগের মতো আর হতাশ বোধ করছে না। হয়তো ইসোবেলকে এ বাড়িতে এনে সে কোনো ভুল করেনি। ইসোবেল তেমন একটা ঝামেলা করছে না। সে সেসিলিকে রান্নাবান্নায় সাহায্য করে। খাওয়ার সময় ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং ভদ্রতা বজায় রেখে। সে একটু আগে আগেই ঘুমাতে যায় এবং বেশিরভাগ সময় দোতলায় নিজের কামরাতেই থাকে। নিজের নতুন জীবন নিয়ে ওকে খুশিই মনে হচ্ছে।

আমার মনে হয় তুমি খুব একাকী বোধ করছ, একদিন রান্নাঘরে বসে ইসোবেলকে বলল সেসিলি। লাঞ্চ প্রায় রেডি। ছুটি শেষ হলেই তুমি নতুন স্কুলে যাবে এবং সেখানে সমবয়সী অনেক নতুন বন্ধুবান্ধব পাবে। এত বড় বাড়িতে তোমার এত কিশোরী মেয়ের একা একা লাগাটাই স্বাভাবিক।

একা! ইসোবেল হাসল সেসিলির দিকে তাকিয়ে। আমি একা নই, মিসেস ফ্রবিশার। এখানে একা থাকার কোনো অবকাশ নেই।

তোমার কথা শুনে খুশি হলাম, বলল সেসিলি। হয়তো ইসাবেল ওদেরকে পছন্দ করতে শুরু করেছে।

কিন্তু তোমার নিজের বয়সী বন্ধুবান্ধব দরকার। স্কুলে বন্ধু হলে তুমি তাদেরকে বাসায় দাওয়াত দিতে পারবে।

আমার সমবয়সী কোনো বন্ধুর দরকার নেই। আমার বন্ধু আমি পেয়ে গেছি।

বাহ্, চমৎকার। তবে তোমার বন্ধু হওয়ার জন্য আমার এবং ফ্রেডেরিকের বয়সটা একটু বেশিই–

আমি আপনাদের কথা বলিনি কিন্তু। তাহলে? কে?

সেসিলি তার কথা শেষ করার আগেই মেয়েটি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর খিলখিল হাসির শব্দ শুনতে পেল সেসিলি হলঘর থেকে যাওয়ার সময়।

.

সেই রাতে খাওয়াদাওয়া শেষে ফ্রেডেরিক এবং সেসিলি হলঘরে ফায়ার প্লেসের সামনে বসেছিল। ইসোবেল দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চুপচাপ। কথা বলতে চাইছে কিন্তু বলার মতো হয়তো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

অবশেষে সেসিলিই ভঙ্গ করল নীরবতা। নিচু গলায় কথা বলছে। স্বর উঁচু করতে যেন ভয় পাচ্ছে।

তোমার চেহারা এমন শুকনো লাগছে কেন, ফ্রেডেরিক? কী হয়েছে? নতুন বইটি ঠিকঠাক লেখা হচ্ছে না?

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল, সেসিলি। কথাটা হয়তো বোকার মতোই শোনাবে তবে সত্য হলো এই যে ইসোবেল আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকে আমি এক কলমও লিখতে পারছি না।

কিন্তু ও তো তোমাকে কোনো বিরক্ত করে না, করে কি? ও কোনো শব্দই করে না। মাঝেমধ্যে ভাবি মেয়েটা বড্ড বেশি চুপচাপ।

না, না। ও আমাকে বিরক্ত করছে না। ব্যাপারটা ইসোবেলকে নিয়ে নয় থেমে গেল সে। চেহারা দেখে মনে হলো ভয় পেয়েছে।

বলো, ফ্রেডেরিক। প্লিজ, বলে ফেলল।

তুমি তো জানোই আমি একা একা লিখি। ঘর একদম নীরব না থাকলে আমি লিখতে পারি না। আমি আমার টেবিলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখে যেতে পারি।

সে তো আমি জানিই। তোমার বিশাল লাইব্রেরি ঘরখানার তো কোনোরকম পরিবর্তন করা হয়নি। তুমি প্রতিদিন সকালে নাশতা সেরে ওখানে লিখতে যাও এবং লাঞ্চ পর্যন্ত টানা লেখো।

হ্যাঁ। তবে কয়েকদিন ধরে কিছু লিখতে পারছি না। আমি বারবার চেষ্টা করেছি লিখব বলে। কিন্তু এক কলমও এগোতে পারিনি। কারণ ওই ঘরে আমি একা নই!

তুমি একা নও! এ কথার মানে কী, ফ্রেডেরিক? তুমি লেখার সময় তো আমি ওই ঘরের ধারেকাছেও যাই না। ইসোবেলও না। যদি যায় তাহলে মানা করে দিও। তুমি বলতে না পারলে আমি ওকে বারণ করব।

না, না। ও আমার ঘরে কখনো যায় না। তবে আমি লেখার টেবিলে বসার পরে একটি গলা শুনতে পাই। নারীকণ্ঠ-বুড়ো মানুষের খনখনে গলা। সে যেন আমাকে কিছু বলতে চায়। কিন্তু আমি তার কথা বুঝতে পারি না। ঘরটি তখন আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। মনে হয় এ ঘরটি আমার নয়। টেবিলটি আমার নয়। চেয়ারটি আমার নয়। লাইব্রেরির কোনো কিছুই আমার নয়।

ফ্রেডেরিক! থামো! সেসিলির গলা চড়ল-আমাকে তুমি ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। তোমার বিশ্রাম দরকার-ছুটি কাটানো প্রয়োজন। আমরা

থেমে গেল সে। একটা ছায়া পড়েছে মুখের ওপর। মুখ তুলে চাইল সেসিলি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে ইসোবেল। তুমি কি চাও? আর এত নিশব্দে হাঁটাচলা করো কেন? ভয় রাগিয়ে তুলেছে সেসিলিকে।

আমি সবসময়ই নিশব্দে হাঁটাচলা করি, জবাব দিল মেয়েটি। হাসছে যেন ওর দিকে তাকিয়ে। আপনারা তো চান বাড়িটি সবসময় চুপচাপ থাকবে। আমি চেষ্টা করি আপনারা যাতে বিরক্ত না হন। আমার খুব তেষ্টা পেয়েছিল। তাই নিচে এসেছিলাম এক গ্লাস পানি খেতে।

তাহলে পানি খেয়ে নিজের রুমে চলে যাও।

জি, মিসেস বিশার।

একটু পরে সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাতের গ্লাসটি টেবিলে রেখে ওদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

আপনাদের কেউই নিশ্চয় আমার দাদিমাকে দেখেননি, দেখেছেন?

আমি দেখিনি, জবাব দিল ফ্রেডেরিক। আমার স্ত্রীও দেখেছে বলে মনে হয় না। তোমরা যখন এ বাড়িতে থাকতে তখন আমরা এখানে আসিনি।

আমার ছোটবেলায় দাদিমা এ বাড়িতে আমাদের সঙ্গে থাকতেন। তাঁকে আমি খুব ভালোবাসতাম। আমাকে তিনি অনেক গল্প বলতেন। পুরোনো দিনের গল্প। দাদিমা এখানেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে আমার বাবা সমস্ত টাকা পয়সা খুইয়ে ফেলে। তারপর আপনারা আমাদের বাড়িটি কিনে নেন।

শুনে খুব খারাপ লাগল, ইসোবেল। তোমার জন্য আমাদের মায়াই হচ্ছে, তবে–

আমার জন্য মায়া করতে হবে না। আমি তো এখন ফিরেই এসেছি। দাদিমা আমাকে বলেছেন বাড়িটি আবার আমার হবে।

ইসোবেল ওদের দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। তবে সবাই দু-এক মিনিট নিশ্চুপ থামল। শেষে সে বলল, আপনার লাইব্রেরি ঘরটি কি আমাকে একটু ব্যবহার করতে দেবেন, মি. ফ্রবিশার? ওটা ছিল আমার দাদিমার স্পেশাল রুম। আমি ছাড়া অন্য কেউ ওই ঘরটিতে ঢুকলে তিনি রেগে যেতেন। আমাকে তিনি চেয়ারে বসিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করতেন। তবে আমি ওই ঘরে গেলেও আপনাকে কোনোরকম বিরক্ত করব না। আমি চুপচাপ থাকব। দাদিমা তখন আমাকে গল্প বলতেন আমি চুপচাপ শুনতাম।

তবে... আমার মনে হয় না... ফ্রেডেরিক তার বাক্য অসমাপ্ত রেখে দিল। আড়চোখে তাকাল স্ত্রীর দিকে। সেসিলি হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ ।

তবে এক্ষুনি আপনাকে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে না। কাল সকালে বললেও হবে। আমি এখন ঘুমাতে যাব। ওহ্, বলতে ভুলে গেছি আমার কাছে দাদিমার একখানা ছবি আছে। নিচে নামার সময় নিয়ে এসেছি। এই যে দেখুন, মিসেস ফ্রবিশার।

সে সেসিলির হাতে ছবিটি খুঁজে দিল। ওটার দিকে তাকিয়ে মুখ সাদা হয়ে গেল সেসিলির। ভয়ার্ত একটা চিৎকার বেরুল গলা চিরে। ছবির মানুষটিকে দেখেই চিনতে পেরেছে। এ বৃদ্ধাকেই সে স্বপ্নে দেখেছে।

.

সেই রাতে ফ্রবিশার দম্পতির কারোরই ঘুম হলো না। বিছানায় শুয়ে নিচু গলায় তারা কথা বলতে লাগল।

আমরা এখন কী করব, ফ্রেডেরিক? ওকে চলে যেতে বলব। ও আমাদেরকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে। আমাদেরকে বাড়ি ছাড়া করবে।

আমাকে বাড়ি ছাড়া করতে পারবে না।

কিন্তু ও তো একা নয়। ওই ভয়ংকর মহিলাও রয়েছে এখানে। ইসোবেলকে সে সাহায্য করছে। ইসোবেল কী বলল মনে নেই? বলেছে ওর দাদিমা নাকি ওকে এ বাড়িটি দিয়ে দেবে। সে আমাদের কাছ থেকে বাড়িটি কেড়ে নেবে।

অসম্ভব। এটি আমাদের বাড়ি। আমরা এটি কিনেছি। আর বৃদ্ধা মহিলা এখানে কী করে আসবে? সে তো মারা গেছে।

তাহলে আমাকে ব্যাখ্যা করো লাইব্রেরি ঘরে কেন তোমার মনে হয় ওখানে তুমি একা নও, সঙ্গে কেউ আছে? কে আছে তোমার সঙ্গে ওই ঘরে? আমি কীভাবে ছবিটি দেখেই চিনে ফেললাম?

কিন্তু, সেসিলি—

চুপ! শোনো!

ওরা শুনতে পেল লাইব্রেরি ঘরের দরজা খুলে গেছে। তারপর আবার বন্ধ হয়ে গেল। হলঘরে মৃদু পায়ের শব্দ। পদশব্দ ওদের বেডরুমের দরজা পার হয়ে গেল। তারপর ইসাবেলের শোবার ঘরের দরজা খোলা এবং বন্ধের আওয়াজ হলো। দূরের অন্ধকার থেকে ভেসে এল মানুষের গলা।

সেসিলি খামচে ধরল তার স্বামীর হাত। আমাকে কালকেই কোথাও নিয়ে চলো, ফ্রেডেরিক। আমি ভয় পাচ্ছি।

আমরা কাল সকালেই কোথাও চলে যাব, সোনা। তবে ইসোবেলকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। ওকে একা বাড়িতে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না।

.

সকাল হতেই ওরা রেডি হতে লাগল। ফ্রেডেরিক সেসিলিকে বলল, একটা সুটকেস গুছিয়ে নাও। আমরা দিন দুই কোনো হোটেলে থাকব। আমি যাই। ইসোবেলকে ঘুম থেকে তুলি গে। তারপর চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব।

তবে সেসিলি রেডি হওয়ার আগেই ফিরে এল ফ্রেডেরিক। জলদি! বলল সে। সুটকেসটা নাও। ইসোবেল তার ঘরে নেই।

ঘরে নেই! তাহলে কোথায় গেছে?

লাইব্রেরি ঘর বন্ধ। তালা মারা। আমি ঢুকতে পারছি না। ইসোবেল ভেতরে আছে। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

সে সেসিলিকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে। ওকে একটা হোটেলে নিয়ে তুলল।

তুমি এখানে নিরাপদেই থাকবে। আমি আসছি এক্ষুনি।

তুমি কোথায় যাচ্ছ, ফ্রেডেরিক?

পুলিশের কাছে। তারপর বাড়ি ফিরব-যদি সত্যি ওটা এখনো আমাদের বাড়ি হয়ে থাকে।

.

জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে আমাকে, বলল পুলিশ অফিসার। তালা ভাঙতে পারিনি। খুব শক্ত।

ফ্রেডেরিক শুধু পুলিশ নয়, সঙ্গে একজন ডাক্তারও নিয়ে এসেছে। তারা লাইব্রেরির সামনে অপেক্ষা করছিল। জানালার কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে পেল তারা। তারপর চাবি ঘোরানোর শব্দ এবং খুলে গেল দরজা।

আপনি ভেতরে আসুন, ডাক্তার। না, আপনাকে আসতে হবে না, মি. ফ্রবিশার। ভেতরের দৃশ্যটি আপনার জন্য খুব একটা সুখকর হবে না।

ফ্রেডেরিকের বুক ধড়ফড় করছে। লাইব্রেরিতে সে কিছু নড়ানোর শব্দ পেল। তারপর পুলিশ কর্মকর্তার কণ্ঠ। একটি চেয়ার নড়ানোর আওয়াজ। ডাক্তার কী যেন বললেন। মিনিটগুলো ঘণ্টার মতো লাগছে।

আবার খুলে গেল লাইব্রেরির দরজা। বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। তিনি ফ্রেডেরিকের হাত ধরে ওকে হলঘরের শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়ে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

সে মারা গেছে, মি. ফ্রবিশার। লেখার বড় চেয়ারটিতে বসে আছে। ওর বয়স যেন কত বললেন?

ষোলো বছর, ডাক্তার।

ষোলো বছর! কিন্তু ওর চেহারায় যা ঘটেছে তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিল। তার সমস্ত চুল পেকে সাদা এবং মুখখানা হয়ে গেছে বুড়ি মানুষের মতো!

পরিত্রাতা – মেরি ক্লার্ক

রোজমেরি হার্ট বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে আছে ম্যান্টলপিসের ওপর ঝোলানো পোর্ট্রেটটির দিকে। বহু বছর ছবিটি চিলেকোঠায় নানির ঘরে ছিল, আজ সকালে রোজমেরির ঘরে আনা হয়েছে ওটা।

নানি মারা গেছেন তাই অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো পোর্ট্রেটটিও বংশাধিকার সূত্রে পেয়ে গেছেন রোজমেরির মা।

এ ছবিটি তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের, মিসেস হার্ট বলেছেন মেয়েকে। নেবে এটা? তোমার ঘরে টাঙিয়ে রাখবে।

সত্যি দেবে আমাকে? উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে রোজমেরি।

তা হলে খুব মজা হবে। ওঁকে দারুণ লাগছে আমার। অভিজাত... রাজকীয়। মায়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। তুমিও অবশ্য তাই।

হেসে উঠলেন মিসেস হার্ট, মেয়ের কাঁধ চাপড়ে বললেন, রাজকীয়-ফাজকীয় বুঝি না তবে উনি ছিলেন আমার প্রপিতামহ। কাজেই চেহারায় মিল থাকতেই পারে।

ব্যক্তিজীবনে ওঁর মতো হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি। উনি খুব সাহসী ছিলেন; রানি ভিক্টোরিয়ার সময়ে যুদ্ধ করেছেন।

উনি সৈনিক ছিলেন নাকি? আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল রোজি। তার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাসও আছে, প্রাচীনকালের ইতিহাস পড়ার সময় সেই সময়ে যেন চলে যায় ও, নিজেকে ইতিহাসের একটা অংশ মনে হতে থাকে। রানি বা রাজকুমারী জাতীয় কিছু একটা ভাবে রোজমেরি নিজেকে।

প্রপিতামহ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মারা গেছেন, বলল ওর মা। সাংঘাতিক আহত হয়েও ব্যাটল অভ ইঙ্কারম্যানে দল নিয়ে গেছেন তিনি, যুদ্ধ করেছেন রাশানদের বিরুদ্ধে। নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেননি কখনো। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন। ইতিহাস বলে, ওই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পেছনে প্রপিতামহের বিরাট ভূমিকা ছিল।

.

সেদিন সারাক্ষণ নিজের পূর্বপুরুষের কথা ভাবল রোজমেরি। কিন্তু তাঁকে তো শুধু প্রপিতামহ গ্রেগরি বলে ডাকা যাবে না, সংক্ষিপ্ত একটা নাম দেওয়া উচিত। অনেক ভেবে রোজমেরি ঠিক করল তাঁর পূর্বপুরুষকে শুধু গ্রেগরি নামেই ডাকবে। কারণ গ্রেগরি তার কাছে রক্ত মাংসের মানুষের মতোই বাস্তব মনে হচ্ছে। যেন ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু।

রাতের বেলা, ঘুমুবার সময় বিচিত্র এক অনুভূতি জাগল রোজমেরির। আগে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে ঘুমাতে তার খুব ভয় লাগত। মাকে অবশ্য এ কথা কখনো বলেনি রোজি মা হাসাহাসি করবে বলে। সত্যি তো, দশ বছরের একটা মেয়ে আলো নিভিয়ে ঘুমাতে ভয় পায় শুনলে সবাই হাসবে।

তবে আজ ভয় লাগছে না। মাথার ওপর গ্রেগরির ছবি আছে বলেই হয়তো। যে লোক যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করতে পারেন তিনি সহজেই তার আত্মীয়, ছোট একটি মেয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবেন। কাজেই রোজমেরির ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বরং, ওকে আরও সাহসী হতে হবে। ভয় পেলে নিজের পূর্বপুরুষকে লজ্জায় ফেলে দেওয়া হবে।

বিছানায় কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে গায়ের চাদর সরিয়ে নিঃশব্দে নেমে পড়ল রোজমেরি, দাঁড়াল জানালার সামনে, পর্দা সরাল। এরকম কাজ আগে কখনো করেনি সে। জানালা সব সময় বন্ধ রেখেছে রোজি। কারণ চাঁদের আলো পড়ে দেয়ালে ভ্যাম্পায়ার আকৃতির যেসব নকশা তৈরি করে, রোজমেরি খুবই ভয় পায়।

জানালা থেকে সরে এল রোজমেরি, তাকাল পোর্ট্রেটের দিকে। গ্রেগরির চোখ ওকে অনুসরণ করছে। বিছানায় লাফ দিল রোজমেরি, হাসল পূর্বপুরুষের দিকে তাকিয়ে।

গুড নাইট, গ্রেগরি, বলল সে। তারপর বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সুইচ টিপে আলো নেভাল রোজমেরি, একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেরাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখল রোজমেরি। তার স্বপ্নে জ্যান্ত হয়ে ছবির ফ্রেম থেকে নেমে এলেন গ্রেগরি। রোজমেরি দেখল দৃশ্যপট বদলে গেছে। সে চলে এসেছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সেই সময়ে। গ্রেগরি বিশাল তরবারি নিয়ে বীর বিক্রমে শত্রুর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কিন্তু বেশিক্ষণ লড়াই করা সম্ভব হলো না। আহত হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। রোজমেরি ছুটে গেল তাঁর কাছে। তিনি মৃত্যুর আগে বলে গেলেন, রোজমেরি, সাহস রাখো। ভয়ের কিছু নেই।

ঘুম ভেঙে গেল রোজমেরির। স্বপ্নটাকে তার খুব বাস্তব মনে হতে লাগল। ভয়ে ভয়ে সে পোর্ট্রেটের দিকে তাকাল। ভেবেছে ওখানে গ্রেগরির ছবির বদলে রাশান। কোনো সৈনিককে দেখবে।

না, গ্রেগরি আছেন আগের জায়গাতেই। শান্ত, স্থির ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রোজমেরি। তুমি তা হলে এখনো ওখানে আছ। বেশ।

সাহস রাখো। পোর্ট্রেটকে যেন বলতে শুনল রোজমেরি।

স্কুলের কাউকে গ্রেগরি সম্পর্কে কিছু বলল না রোজমেরি। ব্যাপারটা গোপন থাকল। তবে গ্রেগরি তার মনে সত্যি সাহস এনে দিলেন। একটা ছোট্ট ঘটনাই এর প্রমাণ।

রোজমেরিদের স্কুলে একটি খেলা খেলে সবাই। প্রথমে বৃত্তাকারে দাঁড়ায় মেয়েরা, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাঝখানে, ঘোরাতে থাকে একটি রশি, রশির অন্য পাশ চাপা থাকে পাথর দিয়ে। এখন ঘুরন্ত ওই রশি এক লাফে পার হয়ে যেতে হবে। টাইমিংটা এক্ষেত্রে নিখুঁত হওয়া চাই। আর এখানটায় রোজমেরির গড়বড় হয়ে যায়। সে রশি পার হতে গিয়ে প্রতিবার আছাড় খেয়েছে। আর ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে হেসে উঠেছে, সেইসাথে পিটি টিচার মিস ব্রিগসের কঠিন ধমক তো আছেই।

তবে এবার ঠিকঠিক রশি পার হয়ে গেল রোজমেরি। সে যখন লাফ দেবে ঠিক করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রেগরির গলা শুনতে পেল, ওকে অভয় দিচ্ছেন তিনি, মাথা ঠান্ডা রাখতে বলছেন। তারপর বলে উঠলেন : এখন! লাফাও!

লাফ দিল রোজমেরি এবং চমৎকারভাবে রশি পার হয়ে গেল। মিস ব্রিগস স্বীকার করতে বাধ্য হলেন আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে রোজমেরির। কিন্তু রোজমেরি তো জানে কৃতিত্বটা আসলে কার।

সেদিন স্কুল লাইব্রেরিতে গিয়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ওপর বই খোঁজ করল রোজমেরি।

অত কঠিন বই তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না, খুকি, লাইব্রেরিয়ান বলল ওকে। সত্যি পড়বে?

মাথা দোলাল রোজি। জি, কারণ আমাদের পরিবারের একজন ওই যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর ছবি আছে আমার কাছে। আমি যুদ্ধটি সম্পর্কে জানতে চাই।

টিফিন পিরিয়ডে খেলার মাঠে বসে ইঙ্কারম্যানের যুদ্ধ সম্পর্কিত লেখা সমস্ত তথ্য গোগ্রাসে গিলল রোজমেরি। শিউরে উঠল যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা জেনে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথাও আছে, উনি যুদ্ধাহত মানুষের সেবা করেছেন। গ্রেগরির সাথে কি ফ্লোরেন্সের সাক্ষাৎ হয়েছিল, ভাবল সে।

রোজমেরি ঠিক করল বড় হয়ে সে নার্স হবে, মানুষের সেবা করবে। কল্পনায় দেখল হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে সে হেঁটে যাচ্ছে, বিছানায় শুয়ে থাকা রোগীদের কুশল জিজ্ঞেস করছে। তারপর দেখল সম্পূর্ণ সাদা পোশাকে সে চার্চে যাচ্ছে, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে তরবারি হাতে লম্বা এক সৈনিক, অপেক্ষা করছে তার জন্য।

বই পোকা! খেলার মাঠে এক মেয়ে ঠাট্টা করে ডাকল রোজমেরিকে। সাথে সাথে কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল রোজি। বইয়ের আরেকটি পাতা ওল্টাতেই গ্রেগরির নাম চোখে পড়ল তার। তার পূর্বপুরুষের নাম সত্যি আছে ইতিহাস বইতে! ক্যাপ্টেন গ্রেগরি হ্যাঁসকস। আবার কল্পনার ডানায় ভর করল। রোজমেরি। দেখল

টিভিতে কুইজ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, ক্যাপ্টেন গ্রেগরি হ্যাঁসকস কে ছিলেন?

প্রত্যেকে তার বাযারে চাপ দিল, প্রথম জন বলল, ব্যাটল অভ ইঙ্কারম্যানের হিরো ছিলেন তিনি।

গর্বে বুক ফুলে গেল রোজমেরির। আমাকে আর কেউ ভীতু বলতে পারবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে। আমি ক্যাপ্টেন হ্যাঁসকসের নাম রক্ষা করব।

.

মাকে বইটি দেখানোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল রোজমেরি, ছুটল বাড়ির দিকে। মা সাধারণত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন তার জন্যে। আজ তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। কলিংবেল টিপল রোজমেরি, অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ পরেও কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে ভয় লাগল ওর। মা কি কোথাও গেছেন? ফেরার পথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন? নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?

হঠাৎ ঝড়াং করে খুলে গেল দরজা, চৌকাঠে এসে দাঁড়াল কুৎসিত দর্শন, বিশালদেহী এক লোক।

এতক্ষণে স্কুল থেকে ফেরার সময় হলো, খুকি! বলল সে বিশ্রী হেসে।

এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, ভেতরে ঢুকতে দিল রোজমেরিকে। মাকে এই সময় দেখতে পেল সে। ম্লান, বিবর্ণ, থরথর করে কাঁপছেন ভয়াল দর্শন লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে।

ওহ্, রোজি, আমার সোনা, প্রায় ডুকরে উঠলেন তিনি, তারপর লোকটাকে বললেন, এবার তুমি চলে যাও, প্লিজ। বললামই তো আমাদের এখানে তোমার কোনো কাজ নেই। দয়া করে চলে যাও!

রোজি, বলল লোকটা। বেশ সুন্দর নাম। লোকটার গলায় এমন কিছু ছিল, ভয় পেয়ে গেল রোজমেরি, তুমি দেখতেও ভারী সুন্দর। ঘুরে দাঁড়াল সে মিসেস হার্টের দিকে। আপনি নিশ্চয়ই চান না আপনার মেয়ের কোনো ক্ষতি হোক? ধরুন, ওর সুন্দর মুখখানায় যদি একটা খুরের পোচ দিই? ঘোঁতঘোঁত করে উঠল লোকটা শেষের দিকে। দেব নাকি?

রোজমেরির কানে কানে কে যেন ফিসফিস করে বলল, সাহস রাখো। মনে মনে জবাব দিল সে। সাহস রাখছি। গ্রেগরি। অবশ্যই সাহস হারাব না।

গলায় জোর এনে রোজমেরি লোকটাকে বলল, তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। নইলে আমি পুলিশ ডাকব।

খ্যাক খ্যাক হেসে উঠল লোকটা। কীভাবে ডাকবে, খুকি? ফোনের লাইন কেটে দিয়েছি। শোনো, ফ্যাচফ্যাচ কোরো না। আমার কিছু টাকা দরকার। দিয়ে দাও। সুবোধ বালকের মতো চলে যাব।

শিরদাঁড়া টানটান করে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল রোজমেরি। তুমি খামোখাই তর্ক করছ। আজকাল বাড়িতে কেউ টাকা-পয়সা রাখে না-লোকে চেক ব্যবহার করে।

মিসেস হার্টের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচালো লোকটা। খুব চালাক মেয়ে বানিয়েছেন তো!

রোজমেরি মায়ের দিকে তাকাল। বসে আছেন তিনি চেয়ারে, ভয়ে সাদা মুখ। ভয় পেয়ো না, মাম্মি, শান্ত গলায় বলল সে। ড্যাডি এক্ষুনি চলে আসবে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল লোকটা। তুমি সত্যি খুব চালাক, রোজি। তোমার বাবা মারা গেছে অনেক আগে, সেকথা জানি না ভেবেছ? সব খবর নিয়েই এসেছি।

হঠাৎ চেহারা বদলে গেল লোকটার, থমথমে হয়ে উঠল। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, বেশ বুঝতে পারছি, হিসহিস করে বলল সে। দেখাচ্ছি মজা!

এক লাফে পৌঁছে গেল মিসেস হার্টের পেছনে, পেছন দিয়ে চেপে ধরল গলা। রোজমেরি স্থির দাঁড়িয়ে রইল, আপনাআপনি শক্ত হয়ে গেল মুঠো। লোকটাকে থামাতে হবে। কিন্তু কীভাবে? কীভাবে? আগে তোমার মাকে শেষ করব তারপর তোমাকে, বিচ্ছু মেয়ে, শুয়োরের মতো ঘোঁতঘোঁত করছে সে, মিসেস হার্টের গলায়। শক্ত আঙুলগুলো চেপে বসল।

গ্রেগরি, গ্রেগরি, ওকে থামাও। মৃগীরোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠল রোজমেরি ।

হতভম্ব দেখাল লোকটাকে, মিসেস হার্টের গলা ছেড়ে দিল। কী বললে তুমি? খেঁকিয়ে উঠল সে। গ্রেগরি আবার কে?

রোজমেরিই প্রথমে দেখতে পেল গ্রেগরিকে। মায়ের চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরনে ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম, হাতে ব্যাটেল অভ ইঙ্কারম্যানের সেই ভারী তরবারি যা দিয়ে বহু শত্রু ঘায়েল করেছেন তিনি। ক্যাপ্টেনকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রোজমেরি, মা বা লোকটা কি দেখতে পাচ্ছে না?

শিউরে উঠলেন মিসেস হার্ট। খুব ঠান্ডা লাগছে। রোজমেরি বুঝতে পারল গ্রেগরির উপস্থিতি টের পেয়েছেন মা। কিন্তু লোকটা? রোজমেরির চিৎকার শুনেই কি সে ওভাবে দমে গেল?

হঠাৎ লোকটার গোটা শরীর ঝাঁকি খেল, হাত মুঠো করল সে, ঘনঘন ঢোক গিলল, কাউকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে। হঠাৎ দুলে উঠল শরীর, ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

ওহ্, মাই গড, আমার হার্ট, গুঙিয়ে উঠল সে। আমার বোধহয় হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে।

মুখ আর শরীর কুঁকড়ে গেল তার, অনবরত গোঙাচ্ছে, চাপ দিয়ে ধরছে বুক।

বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। মনে হচ্ছে কেউ আমাকে ছুরি মেরেছে। সিধে হলো সে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে, পরক্ষণে দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।

.

কিছুক্ষণ পর পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স এল রোজমেরিদের বাড়িতে, শয়তান লোকটার লাশ নিয়ে গেল। হইচই কমলে দোতলায় উঠে এল রোজমেরি, দাঁড়াল পোর্ট্রেটের সামনে।

ওহ্, গ্রেগরি, তুমি সত্যি দারুণ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। চোখে জল নিয়ে বলল ও। গ্রেগরি তাকিয়ে আছেন ওর দিকে, মুখে হাসি। চোখ মুছে রোজমেরিও হাসল। ফিসফিস করে বলল, ব্যাপারটা শুধু আমরা দুজনেই জানি, তাই না?

এমন সময় বাতাস এসে নাড়িয়ে দিল পর্দা। আর ছবিটি সত্যি সত্যি চোখ পিটপিট করে উঠল রোজমেরির দিকে তাকিয়ে।

বানরের প্রতিশোধ – রাসকিন বন্ড

আমি ঠিক নিশ্চিত নই গতরাতে সত্যি কুকুরের ডাক শুনেছি, নাকি ওটা স্বপ্ন ছিল। আমার কটেজের নিচে, পাহাড়ে ঘেউ ঘেউ করছিল কুকুরগুলো। একটা সোনালি ককার, একটা রিট্রিভার, একটা কালো ল্যাব্রাডর, একটা ডুশন্ড এবং আরও দুটো অচেনা জাতের কুকুর। মাঝরাতের পরে ওদের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় আমার। এমন জোরে ডাকাডাকি করছিল, বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে আসি আমি। তাকাই ভোলা জানালা দিয়ে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম ওগুলোকে। পাঁচ-ছটা কুকুর। লম্বা ঘাসের মধ্যে ছোটাছুটি করছিল।

অতগুলো ভিন্ন জাতের কুকুর দেখে আমি খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। মাত্র হপ্তাখানেক আগে এ কটেজে উঠেছি। পড়শিদের সঙ্গে দেখা হলে হাই-হ্যালো বলি। আমার প্রতিবেশী ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্নেল ফ্যানশ একটি ককার পোষেণ। তবে ওটার রঙ কালো। আরেক প্রতিবেশী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বৃদ্ধ দম্পতির কোনো কুকুর নেই। তারা বিড়াল পোষেণ। দুধঅলার আছে একজোড়া মংগ্রেল বা বর্ণসঙ্কর কুকুর। এবং পাঞ্জাবি শিল্পপতি, যিনি এক সাবেক রাজকুমারের প্রাসাদ কিনেছেন, তবে সেখানে থাকেন না-বাড়ি দেখাশোনা করে তাঁর এক দারোয়ান-সেই দারোয়ান বিশালদেহী তিব্বতি ম্যাস্টিফ কুকুর পুষছে।

গতরাতে দেখা কুকুরগুলোর একটির সঙ্গেও এসব কুকুরের কোনো মিল নেই।

এখানে কেউ রিট্রিভার পোষে? সান্ধ্যকালীন ভ্রমণে কর্নেল ফ্যানশর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে প্রশ্নটা করে বসলাম তাঁকে।

এমন কারও খবর আমার জানা নেই, জবাব দিলেন তিনি। ঝোঁপের মতো ভুরুর নিচে অন্তর্ভেদী চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন আমাকে। কেন, এমন কোনো জানোয়ার কি চোখে পড়েছে?

না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম আর কী। এ এলাকায় প্রচুর কুকুর আছে, না?

হুঁ। প্রায় সবাই-ই কুকুর পোষেণ। তবে প্রায়ই প্যান্থারের হামলার শিকার হয় জানোয়ারগুলো। গত শীতে আমি চমৎকার একটি টেরিয়ার হারিয়েছি।

লম্বা, লালমুখো কর্নেল ফ্যানশ অপেক্ষা করতে লাগলেন আমি তাকে আর কিছু বলি কিনা-নাকি চড়াই বেয়ে উঠে হাঁপিয়ে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

ওই রাতে আবারও কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম আমি। জানালার ধারে গিয়ে তাকালাম বাইরে। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে, রুপালি আলোয় চকচক করছে ওকগাছের পাতা।

কুকুরের দল গাছের দিকে তাকাল মুখ তুলে, ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। কিন্তু গাছে কিছু চোখে পড়ল না আমার। এমনকি একটা পেঁচা পর্যন্ত নয়।

আমি কুকুরগুলোকে একটা দাবড়ানি দিলাম। জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

পরদিন কর্নেল ফ্যানশর সঙ্গে দেখা হলে আমার দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকালেন। আমার ধারণা কুকুরগুলো সম্পর্কে তিনি জানেন; কিন্তু আমি কী বলি তা শুনতে চাইছেন। আমি তাঁকে ঘটনাটা খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কাল মাঝরাতে বেশ কয়েকটা কুকুর দেখেছি আমি, বললাম আমি। একটা ককার, একটা রিট্রিভার, একটা পেক, একটা ডুশন্ড এবং একজোড়া মংগ্রেল। এখন, কর্নেল, বলুন ওরা আসলে কী?

কর্নেলের চোখ জ্বলে উঠল। আপনি মিস ফেয়ারচাইল্ডের কুকুরদের দেখেছেন।

অঃ। তিনি থাকেন কোথায়?

তিনি কোথাও থাকেন না, মাই বয়। তিনি পনেরো বছর আগে মারা গেছেন।

তা হলে তাঁর কুকুরগুলো এখানে কী করছে?

বানরের খোঁজ করছে, জবাব দিলেন কর্নেল। আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

ঠিক বুঝলাম না।

ব্যাখ্যা করছি, বললেন কর্নেল। তার আগে বলুন আপনি ভূত বিশ্বাস করেন কিনা।

ভূত-টুত কখনো চোখে পড়েনি।

চোখে পড়েছে, মাই বয়, আপনি ভূত দেখেছেন। মিস ফেয়ারচাইল্ডের কুকুরগুলো কবছর আগে মারা গেছে-একটা ককার, একটা রিট্রিভার, একটা ডুশুন্ড, একটা পেক এবং একজোড়া মংগ্রেল; ওক গাছের নিচে, ছোট একটা টিলায় ওগুলোকে কবর দেওয়া হয়েছে। তবে ওদের মৃত্যু অস্বাভাবিক ছিল না। সবকটা বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তাদের মনিবনীর মৃত্যুশোকও সইতে পারেনি বেশিদিন। মিস ফেয়ারচাইল্ডের মৃত্যুর পরে প্রতিবেশীরাই কুকুরগুলো দেখাশোনা করত।

এবং আমি যে কটেজে থাকি সেখানে মিস ফেয়ারচাইল্ড থাকতেন? তিনি কি তরুণী ছিলেন?

তাঁর বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশের কোঠায়, সুগঠিত শরীরের অধিকারিণী। বেড়াতে খুব ভালোবাসতেন। পুরুষদেরকে তেমন পাত্তা তেমন দিতেন না। আমি ভেবেছি আপনি ওঁর কথা জানেন।

না, জানি না। আমি এখানে এসেছি অল্প কদিন, জানেনই তো। কিন্তু বানর নিয়ে কী যেন বলছিলেন? কুকুরগুলো বানর খুঁজবে কেন?

ওটাই এ গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ। লম্বা লেজঅলা লেঙ্গুর বাঁদর কখনো চোখে পড়েছে আপনার? ওকের পাতা খেতে আসে।

না।

চোখে পড়বে। আজ হোক বা কাল হোক। এখানকার জঙ্গলে এ বানরগুলো দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এমনিতে কারও ক্ষতি করে না, তবে সুযোগ পেলে বাগানে ঢুকে সাবড়ে দেয় যাবতীয় ফলমূল... তো, মিস ফেয়ারচাইল্ড এ বানরগুলো দুচোখে দেখতে পারতেন না। ডালিয়া ফুল খুব ভালোবাসতেন তিনি। নিজের বাগানে বিরল প্রজাতির কিছু ডালিয়ার চাষ করেছিলেন মিস ফেয়ারচাইল্ড। যারা বাগান করেন, তাঁদের প্রিয় ফুলের গাছ ধ্বংস হয়ে গেলে উন্মাদ হওয়ারই কথা। মিস ফেয়ারচাইল্ড এরপর থেকে বাগানে তাঁর কুকুরগুলোকে পাহারায় বসান। বানর দেখলেই তিনি পোষা জানোয়ারদের ওগুলোর পেছনে লেলিয়ে দিতেন। এমনকি মধ্যরাতেও। তবে বানরদের কোনো ক্ষতি করতে

পারত না কুকুরের দল। বানররা তরতর করে গাছে উঠে পড়ত। কুকুরগুলো গাছের নিচে ঘেউ ঘেউ করত।

তারপর একদিন, না দিনে নয়, রাতে-প্রতিশোধের বাসনায় শটগান নিয়ে জানালার ধারে বসে পড়েন মিস ফেয়ারচাইল্ড। বানরগুলো বাগানের কাছে আসামাত্র একটাকে গুলি করে মেরে ফেলেন।

বিরতি দিলেন কর্নেল। তাকালেন ওকগাছের দিকে। বিকেলের উষ্ণ আলোয় ঝলমল করছে গাছগুলো।

কাজটা তাঁর করা উচিত হয়নি, বললেন তিনি।

বানরদের গুলি করা কারও উচিত নয়। এরা হিন্দুদের কাছে দেবতার মতোত পূজনীয় বলেই নয়-ওদের সঙ্গে মানুষের তো অনেক মিল আছে। যাকগে, আজ যাই। একটু কাজ আছে। আকস্মিক গল্পে উপসংহার টেনে দিলেন কর্নেল, লম্বা পা ফেলে দেবদারু গাছগুলোর আড়ালে চলে গেলেন।

সেরাতে কুকুরের চিৎকার কানে এল না আমার। তবে পরদিন বানর দেখতে পেলাম-সত্যিকারের বানর, ভূত নয়। বুড়ো ধাড়ি-জোয়ান মিলে সংখ্যায় কমপক্ষে কুড়ি জন

হবে। গাছে বসে ওকপাতা চিবুচ্ছে। আমাকে গ্রাহ্য করল না ওরা। আমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে।

বানরগুলো দেখতে খারাপ নয়। গায়ের নোম রুপালি-ধূসর, লেজ লম্বা, সাপের মতো। স্বচ্ছন্দে এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফাচ্ছে ওরা, পরস্পরের প্রতি বিনীত, দ্র আচরণ-সমভূমির লাল বানরগুলোর এত অভব্য নয়। ছোট বানরগুলো পাহাড়ের নিচে ছোটাছুটি করছে, খেলছে, কুস্তি লড়ছে স্কুলছাত্রদের মতো।

ওদেরকে ধাওয়া করার এত কোনো কুকুর নেই-প্রলুব্ধ করার মতো ডালিয়াও নেই।

ওই রাতে আবার কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম। আগের চেয়ে উত্তেজিত হয়ে ডাকাডাকি করছে।

এবারে আর বিছানা ছেড়ে উঠছি না আমি, বিড়বিড় করে কম্বলটা টেনে দিলাম মাথার ওপরে।

কিন্তু চিৎকার-চেঁচামেচি ক্রমে জোরাল হয়ে উঠল, এর সঙ্গে যোগ হলো আরেকটি কণ্ঠ। কিচকিচ করছে কেউ।

হঠাৎ নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল জঙ্গল থেকে। এমন ভয়ংকর চিৎকার, ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

আমি লাফ মেরে বিছানা ছাড়লাম। ছুটে গেলাম জানালার ধারে।

এক মহিলা চিত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, তিন/চারটা প্রকাণ্ডদেহী বানর তার শরীরে চড়ে বসেছে। তারা মহিলার হাত কামড়ে মাংস তুলে নিচ্ছে, একজন কামড়ে ধরল গলা। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে, চেষ্টা করছে বানরগুলোকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু পারছে না। পেছন থেকে আরও কয়েকটা বানর তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। মহিলার কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না কুকুরগুলোকে। মহিলা আবার রক্ত হিম করা আর্তনাদ ছাড়ল। আমি লাফ মেরে ঘরে চলে এলাম। ছোট কুঠারটি নিয়ে ছুটলাম বাগানে।

কিন্তু সবাই-কুকুর, বানর মায় রক্তাক্ত মহিলা পর্যন্ত অদৃশ্য। আমি হাতে কুঠার নিয়ে, খালি গায়ে পাহাড়ের নিচে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম।

পরদিন ঠাট্টার সুরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল, এখনো রাতে কুকুরগুলোকে দেখেন নাকি?

শুধু কুকুর নয়, বানরও দেখেছি, জবাব দিলাম আমি।

হ্যাঁ, ওগুলো মাঝে মাঝে আসে এদিকে। তবে কারও ক্ষতিটতি করে না।

জানি-তবে গতরাতে কুকুরগুলোর সঙ্গে দেখেছি ওদেরকে।

তাই নাকি? অদ্ভুত ব্যাপার তো, খুবই অদ্ভুত।

কর্নেল অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। তবে আমার কথা শেষ হয়নি তখনো।

কর্নেল, বললাম আমি, আপনি কিন্তু আমাকে বলেননি মিস ফেয়ারচাইল্ড কীভাবে মারা গেছেন।

বলিনি বুঝি? বোধহয় মনে ছিল না। বয়স হয়ে যাচ্ছে তো, অনেক কিছুই মনে থাকে না। তবে মিস ফেয়ারচাইল্ডের মৃত্যুর কথা মনে আছে আমার। বেচারি, বানরগুলো তাঁকে হত্যা করে। স্রেফ টুকরো টুকরো করে ফেলছিল মহিলাকে...

কর্নেলের কণ্ঠ ক্রমে নিচু হয়ে আসে, তিনি একটা কেন্নোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর হাতের ছুড়ি বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে প্রাণীটা।

ওদেরকে গুলি করা উচিত হয়নি তাঁর, বলেন তিনি, বানরকে গুলি করা কারোরই উচিত নয়-ওরা তো মানুষের মতোই, আপনি জানেন...

লাশ – গি দ্যু মোপাসাঁ

গত গ্রীষ্মে, প্যারিস থেকে কয়েক মাইল দূরে, সিন নদীর তীরে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। ওখানে প্রতিরাতে যেতাম ঘুমাতে। কয়েকদিনের মধ্যেই, আমার এক পড়শির সঙ্গে খাতির হয়ে গেল। লোকটির বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এরকম অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে আগে কখনো পরিচয় হয়নি আমার। লোকটি দাঁড় বাইতে খুব পছন্দ করত। সবসময়ই তাকে পানির ধারে কিংবা নদীতে দেখতাম। এ লোকের বোধহয় নৌকার মধ্যে জন্ম, নৌকাতেই হয়তো একদিন। তার মৃত্যু হবে।

একদিন সিন নদীর তীর ধরে দুজনে হাঁটছি, লোকটির কাছে নদীসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলাম। হঠাৎ লোকটি উত্তেজিত হয়ে উঠল, তার চেহারার রং কেমন বদলে গেল, বাকপটু হয়ে উঠল সে এবং প্রায় কবিত্ব এসে গেল তার কথাবার্তায়। তার বুকের মধ্যে একটি জিনিসই শুধু অনুরণন তোলে, একটি বিষয়েই তার যত আগ্রহ এবং অনুরাগ-আর তা হলো নদী।

আহ! বলল সে আমাকে, আমাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া এ নদীকে নিয়ে কত যে স্মৃতি রয়েছে আমার! আপনারা যারা শহরে থাকেন তারা নদীর মাহাত্ম বুঝতেই পারবেন না। কিন্তু একজন জেলের কাছে শব্দটি একবার কেবল উচ্চারণ করে দেখুন। তার কাছে নদী বড় রহস্যময়ী, প্রগাঢ়, অচেনা, কল্পনা এবং মরীচিৎকার এক দেশ। যেখানে রাতের

বেলা মানুষ এমন কিছু দেখে যার কোনো অস্তিত্ব নেই, যেখানে লোকে অদ্ভুত সব শব্দ শোনে, যেখানে অকারণেই একজনের শরীরে উঠে যায় কাঁপুনি যেন গোরস্তানের ভেতরে সে হাঁটছে। এবং সত্যি এটি এক ভয়ানক গোরস্তান-যে কবরখানায় কোনো কবর নেই।

জেলেদের কাছে জমিন সীমাবদ্ধ কিন্তু রাতের বেলা অমাবস্যার কালে নদী মনে হয় সীমাহীন। সাগরের প্রতি নাবিকদের কোনো অনুভূতি নেই। সমুদ্র মাঝেমধ্যে বেপরোয়া হয়ে ওঠে, তর্জন গর্জন করে, আবার আপনার সঙ্গে ভদ্র আচরণও করে। কিন্তু নদী নীরব এবং বিশ্বাসঘাতক। এটি কখনো ফিসফাস শব্দ করে না, নিঃশব্দে বয়ে চলে এবং নিরন্তর এই বয়ে চলা আমাকে সাগরের বড় বড় ঢেউয়ের চেয়েও বেশি আতঙ্কিত করে তোলে।

স্বপ্নচারীরা ভান করে সমুদ্র তার বুকে নীল দিগন্তকে লুকিয়ে রাখে যেখানে ডুবন্ত মানুষ বড় বড় মাছদের সঙ্গে সামনে-পেছনে পাক খায়। কিন্তু নদীর রয়েছে কেবল নিঃসীম কালো গভীরতা, যেখানে পিচ্ছিল কাদার মধ্যে পচে যায় লাশ। এর সমস্ত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে যখন ভোরের সূর্যের আলোয় চিকমিক করে জল অথবা নলখাগড়ার গায়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের ফিসফিসানির সঙ্গে তীরে ছলাৎ ছল বাড়ি মারে জল।

তবে আপনি আমার স্মৃতিকথা জানতে চেয়েছেন। আপনাকে আমার জীবনের একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলব যেটি ঘটেছিল দশ বছর আগে।

তখন আমি বাস করতাম, এখনো করি, বুড়ি ল্যাফনের বাড়িতে। আমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু লুইস বানেট, সে এখন সরকারি চাকরিতে ঢুকেছে বলে নৌকা চালানোর শখ বাদ দিয়েছে, বাস করত সি গাঁয়ে-এখান থেকে দুই ক্রোশ দূরে। আমরা প্রতিদিন একসঙ্গে ডিনার করতাম-কখনো ওর বাড়িতে, আবার কখনো ও আমার বাড়িতে আসত মেহমান হয়ে।

একা রাতে আমি একা একা বাড়ি ফিরছি, বেজায় ক্লান্ত, আমার বারো ফুট লম্বা ভারী নৌকাখানার দাঁড় বাইছি শ্রান্ত দেহে, যেটি আমি সাধারণত রাতের বেলাতেই করে থাকি, কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেলাম রেলরোড সেতু থেকে শ দুই মিটার দূরের ঘন নলখাগড়ার ঝোঁপটার ধারে, খানিক দম নেওয়ার জন্য। চমৎকার সুন্দর রাত; ঝলমলে চাঁদের আলোয় ঝিলমিল নদীর জল, বাতাস শান্ত এবং মৃদু। এমন চমৎকার পরিবেশে মনের সুখে ধূমপান করার মজাই আলাদা। আমি নদীতে নোঙর ছুঁড়ে দিলাম পাইপ ধরিয়ে টানবার জন্য।

নৌকা স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলছিল, নোঙর সাঁ সাঁ করে নিচে নামতে নামতে একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল; আমি স্টার্নে, ভেড়ার চামড়ার গালিচার ওপর আরাম করে বসলাম। কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু তীরে ঢেউয়ের বাড়ি খাওয়ার মৃদু ছলাৎ ছলাৎ ছাড়া। ওখানে মানুষ সমান লম্বা নলখাগড়াগুলো অদ্ভুত সব আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝেমধ্যে দোল খাচ্ছে বাতাসে।

নদী একদম স্থির এবং নিশ্চল, তবে চারপাশের অস্বাভাবিক নীরবতা আমি উপভোগই করছিলাম। সকল প্রাণীকুল-কোলাব্যাঙ এবং সোনাব্যাঙ, জলার নৌকা সঙ্গীত শিল্পী যারা- চুপ করে আছে। হঠাৎ আমার ডান দিকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ডেকে উঠল একটা ব্যাঙ। চমকে উঠলাম আমি। তারপর আবার অটুট নিস্তব্ধতা। আমি আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি ধূমপানে মনোনিবেশ করলাম। স্বভাবে অতিশয় ধূমপায়ী হলেও সেরাতে ধূমপান করতে পারছিলাম না। দ্বিতীয়বার পাইপে টান দেওয়ার পরেই গা কেমন গুলিয়ে উঠল। আর মুখ দিলাম না পাইপে। গুণগুণিয়ে একটি গানের সুর ভাঁজতে লাগলাম। নিজের গলার সুর নিজের কাছেই বড় বেসুরো ঠেকল। তাই আমি নৌকার তলায় হাত-পা টান টান করে শুয়ে নিবিষ্টচিত্তে আকাশ দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপই শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ নৌকাটি দুলতে শুরু করলে অস্বস্তি বোধ হলো আমার। মনে হলো এপাশে ওপাশে ধাক্কা খাচ্ছে। তারপর মনে হলো কোনো অদৃশ্য শক্তি এটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়, তারপর আবার তুলে ফেলছে ওপর দিকে। আমি যেন ঝড়ের মাঝখানে হুটোপুটি খাচ্ছি; চারপাশে নানারকম শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম; দারুণ চমকে গিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। দেখি নদীর জলে রুপালি চাঁদের আলো গলে গলে পড়ছে, সবকিছু আশ্চর্য শান্ত।

আমার স্নায়ুগুলো অস্থির হয়ে উঠছিল। ঠিক করলাম এখান থেকে চলে যাব। নোঙরের শিকল ধরে টান দিলাম। দুলে উঠল নৌকা তখন বাধাটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। আমি জোরে জোরে টানতে লাগলাম শিকল। কিন্তু নোঙর তো উঠে আসে না। নদীর তলায় কোনো কিছুতে ওটা আটকে গেছে। আমি টেনেও তুলতে পারছি না। আবার

মারলাম টান-বৃথা চেষ্টা। বৈঠা দিয়ে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিলাম উজানের দিকে নোঙরের অবস্থান পরিবর্তন করতে। কিন্তু কোনোই লাভ হলো না। নোঙর এখনো নদীর তলায় গেঁথে বা আটকে রয়েছে। রাগের চোটে আমি শিকল ধরে সজোরে নাড়া দিলাম। কিছুই ঘটল না। এ শিকল ছেঁড়ার সাধ্য আমার নেই কিংবা নৌকা থেকে এটা ছুটিয়ে নিতেও পারব না কারণ জিনিসটা ভয়ানক ভারী এবং ওটা নৌকার গলুইতে আমার বাহুর চেয়েও মোটা কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে বোলটু দিয়ে আটকানো। তবে যেহেতু আবহাওয়া ছিল চমৎকার তাই ভাবছিলাম আমাকে বেশিক্ষণ হয়তো অপেক্ষা করতে হবে না। কোনো না। কোনো জেলে নৌকার চোখে পড়ে যাব। আমাকে দেখলে তাদের কেউ এগিয়ে। আসবে সাহায্য করতে। আমার দুর্বিপাক আমাকে শান্ত করে রাখল। আমি বসলাম এবং পাইপ ফুকলাম। আমার সঙ্গে ব্রান্ডির একটি ফ্লাস্ক ছিল। দুই-তিন গ্লাস ব্রান্ডি পান করলাম। প্রচুর গরম পড়েছে। প্রয়োজন হলে নক্ষত্ররাজির নিচে শুয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়েই রাত পার করে দিতে পারব।

হঠাৎ নৌকার পাশে একটা শব্দ হতে আমি দারুণ চমকে গেলাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শীতল স্রোতধারা বইল। শব্দটির উৎস, কোনো সন্দেহ নেই, স্রোতে ভেসে আসা কোনো কাঠের টুকরো, তবু একটা অদ্ভুত অস্থিরতা আমাকে গ্রাস করল। আমি নোঙরের শিকল চেপে ধরে প্রাণপণে টানতে লাগলাম। নোঙর স্থিরই রইল। আমি ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে বসে পড়লাম।

তবে ধীরে ধীরে নদী ঢেকে যাচ্ছিল ঘন সাদা কুয়াশার অবগুণ্ঠনে, জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসছিল। আমি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েও না নদী, না আমার পা অথবা নৌকা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু নলখাগড়ার ডগা এবং তার পেছনে চাঁদের আলোয় ম্লান সমভূমি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেদিকে বড় বড় কালো কালো বিন্দু সটান ঊর্ধ্বমুখী। ওগুলো ইটালিয়ান পপলার গাছের সারি। আমার কোমর পর্যন্ত ঢেকে গিয়েছিল সাদা কাপড়ের এত অদ্ভুত কুয়াশায়। তখন উদ্ভট সব চিন্তা খেলছিল মাথায়। কল্পনা করছিলাম কেউ আমার নৌকায় ওঠার চেষ্টা করছে। তবে কুয়াশার কারণে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। নদী অদৃশ্য অস্বচ্ছ কুয়াশার পর্দার আড়ালে। মনে হচ্ছিল ওই পর্দার পেছনে কিম্ভুত সব প্রাণী সাঁতরে আসছে আমার দিকে। ভয়ানক একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল আমাকে। খুলির মাঝখানে শিরশিরে একটা অনুভূতি, নিশাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে; আমার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। আমি সাঁতার কেটে পালাবার কথা ভাবছিলাম। তক্ষুনি একটা চিন্তা ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল। দেখলাম আমি যেন হারিয়ে গিয়েছি, দুর্ভেদ্য কুয়াশার মধ্যে এদিক-সেদিক ভেসে চলেছি, চলেছি লম্বা লম্বা ঘাস আর নলখাগড়ার মাঝ দিয়ে, ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ, তীর দেখতে পাচ্ছি না, নৌকা খুঁজে পাচ্ছি না। এই কালো জলের অতলে কেউ আমার পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামাচ্ছে।

আমার আসলে আগেই উচিত ছিল সাঁতরে নদীর পাঁচশো মিটার পথ পাড়ি দিয়ে নলখাগড়ার ঝোঁপের মধ্যে উঠে পড়া। ওখানে পায়ের নিচে মাটি থাকত আমার। তবে আমি যত ভালো সাঁতারুই হই না কেন দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ ঝুঁকিই থাকত নদীতে ডুবে মরার।

আমি যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চাইলাম। বুঝতে পারছিলাম আমার ইচ্ছাশক্তি ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে; তবে ইচ্ছাশক্তির পাশে আরেকটি জিনিস ছিল যেটির মধ্যে কাজ করছিল ভয়। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম কীসে ভয় পাচ্ছি; আমার মনের সাহসী অংশ মনের ভীরু অংশকে তীব্র ভর্ৎসনা করছিল; এবং আমি এর আগে এত ভালোভাবে কখনো উপলব্ধি করিনি যে আমাদের মনের মধ্যে বিপরীতধর্মী দুটি জিনিস সারাক্ষণ লড়াই করছে এবং একটি অপরটির ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইছে।

এই নির্বোধ এবং ব্যাখ্যাতীত ভীতি আতঙ্কে পরিণত হলো। আমি নিশ্চল হয়ে রইলাম, চক্ষুজোড়া বিস্ফারিত, উৎকর্ণ কান। কীসের আওয়াজ বা শব্দ শুনব। বলে আশা করছিলাম আমি? জানি না। তবে বোধহয় ভয়ানক কিছু একটা ঘটবে বলে আশঙ্কিত ছিলাম। ওই সময় যদি কোনো মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠত, যা সচরাচর ঘটে, আমি বোধকরি আঁতকে উঠে অজ্ঞানই হয়ে যেতাম।

তবু, প্রাণপণ চেষ্টায় আমি আমার বোধবুদ্ধি প্রায় ফিরে পেলাম যা আমার কাছ থেকে পালিয়েই যাচ্ছিল। আবারও ফ্লাস্কটি তুলে নিলাম হাতে, বড় বড় ঢোকে পান করতে লাগলাম পানীয়। তারপর একটি বুদ্ধি এল মাথায়। আমি শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে ঘুরে ঘুরে চিৎকার দিতে লাগলাম। গলা যখন পুরোপুরি ভেঙে গেল চিৎকার করতে করতে চুপ হয়ে গেলাম। পাতলাম কান। অনেক দূর থেকে ভেসে এল কুকুরের ডাক।

আবার ব্রান্ডি পান করলাম এবং নৌকার তলায় শুয়ে পড়লাম পিঠ দিয়ে। ঘণ্টাখানেক কিংবা দুই ঘণ্টাও হতে পারে ওভাবে শুয়ে রইলাম আমি চোখ মেলে তাকিয়ে। নানান দুঃস্বপ্ন ঘিরে থাকল আমায়। উঠে বসার সাহস হচ্ছিল না। যদিও প্রবল একটা ইচ্ছা জাগছিল মনে। মনে মনে নিজেকে বলছিলাম ওঠো! উঠে পড়ো! কিন্তু নড়াচড়া করতে বিষম ভয় লাগছিল। অবশেষে অনেক সাবধানে এবং নিঃশব্দে শরীরটাকে টেনে তুললাম আমি। উঁকি দিলাম নৌকার কিনার দিয়ে।

অমন অপূর্ব সুন্দর এবং মনোহর দৃশ্য জীবনে দেখিনি। ঘণ্টা দুই আগেও যে কুয়াশা ভাসছিল জলের ওপর তা ক্রমে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নদীতীরে স্তূপ হয়ে জমে আছে। নদী এখন ঝকঝকে। কুয়াশা নদীর দুই পাশে ছয়-সাত মিটার উচ্চতায় নিচু দুটি পাহাড় তৈরি করেছে। পূর্ণিমার আলোয় মনে হচ্ছিল যেন বরফ পাহাড়। আমার মাথার ওপর নীল দুধ সাদা আকাশে বিশাল জ্বলজ্বলে চাঁদ।

জলের প্রাণীগুলো এবার যেন ফিরে পেল প্রাণ, কোলাব্যাঙ ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ করে ডাকতে লাগল, আমার ডান এবং বাম দিক থেকে ভেসে আসতে লাগল জলার ব্যাঙদের কোরাস। অদ্ভুত ব্যাপার আমার আর ভয় করছিল না। ওই অপরূপ দৃশ্যপট আমার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দেয়।

দৃশ্যটি কতক্ষণ দেখেছি মনে নেই কারণ এক সময় আমি ঘুমে ঢুলতে থাকি। আবার চোখ মেলে দেখি চাঁদ নেই আকাশে, চারদিকে মেঘের ভেলা। নদীর জলে ছলাৎ ছলাৎ, বাতাসের কানাকানি, শীত শীত লাগছে, নিবিড় হয়ে এসেছে আঁধার।

ফ্লাস্কে যেটুকু ব্রান্ডি তখনো অবশিষ্ট ছিল পুরোটা গিলে নিলাম ঢকঢক করে। তারপর কম্পমান দেহে শুনতে লাগলাম নলখাগড়ার ঝোঁপের মধ্যে শশর শব্দ আর নদীর ভুতুড়ে আওয়াজ। আমি চোখ কুঁচকে অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভীষণ অন্ধকারে আমার নৌকা কিংবা নিজের হাত কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হাত চোখের সামনে এনেও দেখতে পাচ্ছিলাম না।

যাহোক, আস্তে আস্তে আঁধারের কালো পর্দাটি কেটে যেতে লাগল। হঠাৎ মনে হলো একটা ছায়া চলে এসেছে আমার পাশে। ভয়ে চিৎকার দিলাম! সাড়া দিল একটি কণ্ঠ-একজন জেলে। আমি তার উদ্দেশে হক ছাড়লাম। সে এগিয়ে এল। আমার অসহায়ত্বের কথা তাকে জানালাম। সে তার নৌকা নিয়ে এল আমার নৌকার পাশে। দুজনে মিলে শিকল ধরে টানতে লাগলাম। কিন্তু নোঙর নড়ে না।

অবশেষে ফর্সা হলো। ধূসর, শীতল, বৃষ্টির একটি দিনের আবির্ভাব ঘটল। এরকম দিন সবসময়ই দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। আমি আরেকটি জেলে নৌকা দেখতে পেয়ে ডাক দিলাম। এগিয়ে এল সে। ওই লোকটিও যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। তিনজন মিলে টানতে শুরু করলাম শিকল। একটু একটু করে আত্মসমর্পণ করল নোঙর। টের

পাচ্ছিলাম খুব ভারী কিছু নিয়ে ওটা ওপরে উঠে আসছে। অবশেষে ওটাকে টেনে তুললাম কালো আবর্জনার একটা পিণ্ডসহ।

আর আবর্জনার পিণ্ডটি হলো এক বৃদ্ধার লাশ, গলায় মস্ত একটি পাথর বাধা!

সরাইখানার ভূত – গাই প্রেস্টন

গ্রামের ডাক্তারদের জীবন বেশ কষ্টের। কারণ, বিশাল গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় তাদের একটা সেকেলে সাইকেল ছাড়া যানবাহন বলতে আর কিছুই থাকে না। এই সাইকেলটা নিয়েই ডাক্তার গ্রামের এবড়োখেবড়ো পথ, ভাঙা রাস্তা অতিক্রম করে তারা রোগী দেখতে যান সময়ে-অসময়ে।

এক শীতের রাত। সাড়ে চারটার সময় কলিংবেলের আওয়াজে সাটন নামে এক ডাক্তারের ঘুম ভেঙে যায়। অত্যন্ত বিরক্ত হন তিনি। ডাক্তার সাটন অবিবাহিত। বাড়িতে একাই থাকেন। কলিংবেলের আওয়াজ একটানা বেজেই। চলেছে। কিন্তু ডাক্তারের মোটেও ইচ্ছে নেই উঠে গিয়ে দরজা খোলার। ডাক্তার ভাবলেন, দরজা খুলেই হয়তো তাকে শুনতে হবে-উইলির পায়ের আঙুল ব্যথা হয়েছে। তাকে যেতে হবে তাড়াতাড়ি। ওরা ভাবে ডাক্তারদের বুঝি ঘুমানোর কোনো প্রয়োজন নেই। বেলের শব্দ পাত্তা না দিয়ে ডাক্তার আরও জড়োসড়ো হয়ে লেপ মুড়ি দিলেন।

কিন্তু যেভাবে কলিংবেলের আওয়াজ হচ্ছে তাতে ডাক্তারের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে আগন্তুক মহা নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তিনি দরজা খুলতে বাধ্য হলেন।

দরজার বাইরে অন্ধকারে তাকাতেই ঝড়ের বেগে এক লোক প্রবেশ করল। ঘরের ভেতরে। এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে জড়িয়ে ধরল ডাক্তারকে। ডাক্তার চেষ্টা করেও হাত ছাড়িয়ে নিতে পারলেন না। আগন্তুক আরও জোরে ডাক্তারকে চেপে ধরল। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি ডাক্তার সাটন? আমার একজন ডাক্তার দরকার খুব।

হ্যাঁ, আমি সাটন, বললেন ডাক্তার।

তাহলে বলুন আমি কি পাগল? ঈশ্বরের দোহাই আপনার।

ডাক্তার উত্তর দেবার আগে তাকালেন আগন্তুকের দিকে। আশ্চর্য তার চেহারা, চুলগুলো এলোমেলো। ঘামে ধুলোয় চটচটে পোশাক ছিন্নভিন্ন। রক্ত আর ধুলো কাদায় বীভৎস হয়ে আছে তার চেহারা। চোখেও বুনোদৃষ্টি। আগন্তুকের কণ্ঠে উদ্বেগ আর আকুতির প্রকাশ দেখে ডাক্তার বললেন, খুব ভয় পেয়েছেন দেখছি! এই বলে তাকে একটা চেয়ারে বসতে দিলেন। একটু ব্র্যান্ডি এনে তাকে খেতে দিলেন। আগন্তুক ব্র্যান্ডিটুকু এক ঢেকে গিলে ফেলল। আস্তে আস্তে তার মুখে রক্তের আভাস ফুটে উঠল।

এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল ঘরে। ডাক্তার ভালো করে তার রোগীকে লক্ষ করলেন। বুঝতে পারলেন তাড়াহুড়ার কিছু নেই, রোগী নিজেই সামলে উঠে তার

অবস্থার কথা জানাবে। আগন্তুক বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তার স্নায়ুর উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে তা সহ্য করা তার পক্ষে বেশ কঠিন হচ্ছে।

ডাক্তারের ধারণাই সঠিক হলো। কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল আগন্তুক

আমার নাম ফ্রাঙ্ক মেথুয়েন। ফটোগ্রাফির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আমার ব্যবসা। আমার কোম্পানি মেসার্স বার্ডসে অ্যান্ড ব্ল্যাক দিন পনেরো হলো আমার উপর এই জেলার ভার দিয়েছে। আমি জানি এলাকাটা আদৌ সুবিধার নয়। কিন্তু চাকরি করতে গেলে অত বাছবিচার চলে না। প্রায়ই আমাদের এমন কিছু কাজ করতে হয় যা আমরা মোটেও পছন্দ করি না। আমি লন্ডনের মানুষ। কিন্তু আমাকে যদি ককারমাউথের কাছে হায়ারে বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয় তখন আমার মনের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।

ডাক্তার মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে উৎসাহ দিলেন এবং আরও দুগেলাস ব্র্যান্ডি ঢাললেন। আগন্তুক যদিও তাকে ভোরের অনেক আগে বিছানা থেকে তুলেছে তবু ডাক্তার তার ব্যাপারে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তাছাড়া তার ঘুমের ঘোরও অনেকক্ষণ হলো কেটে গেছে। ফায়ার প্লেসের কাঠও এতক্ষণে গনগনে হয়ে ঘরটাকে বেশ আরামদায়ক করে তুলেছে।

আগন্তুক বলে চলেছে–চেষ্টা করছি অন্য কিছু করতে। কিন্তু তেমন কিছুই করতে পারছিলাম না। এই জলা এলাকায় আর কী ব্যবসা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম

ওয়ার্কিংটন আর হোয়াইট হ্যাঁভেন জেলায় চেষ্টা করে দেখব, তাই গতরাতে বাইকে করে বেরিয়ে পড়লাম। যাতে সময় থাকতে থাকতেই হোয়াইট হ্যাঁভেনের রয়্যাল হোটেলে পৌঁছে গোসল সেরে, একটু ঘুমিয়ে সকালবেলা আবার কাজে বেরোতে পারি। কিন্তু আমার ভাগ্য ছিল বিরূপ।

হঠাৎ নির্জন এলাকায় আমার বাইক অচল হয়ে গেল, আমি তখন একা নির্জন জলা এলাকায়। দেখলাম আমার পেট্রোল ট্যাংকে লিক হয়েছে। এবং বাড়তি পেট্রোলের ট্যাংকেও দেখলাম খুব সামান্য তেল আছে। নিশ্চয়ই কেউ চুরি করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি লিকটা চুইংগাম দিয়ে সাধ্যমতো মেরামত করে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু মাত্র সিকি মাইলের মতো এগিয়েছি, এমন সময় আবার তেল চুঁইয়ে পড়তে লাগল। সম্পূর্ণ আটকে পড়লাম আমি। রাত দশটা। চারদিকে পিচের এত অন্ধকার। ধারে কাছের গ্রাম সেখান থেকে অন্তত ছমাইলের মতো। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। তার উপর আবার কুয়াশা ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে। আমি মোটেও ভীতু নই। তবুও কেন জানি অমঙ্গলের আশঙ্কায় মন ভরে উঠল। সেই অমঙ্গল যেন আমার দুরবস্থা দেখে খুশিতে বাকবাকুম। তার নিশ্বাস আমি অনুভব করছি। তার দাঁড়াগুলো যেন আমাকে ঝোঁপের ভেতরের গর্তটার দিকে এগোতে বলছে। আমি বাধা দিতে চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। তার বিরুদ্ধে আমি যেন অসহায়।

গর্তটার কাছাকাছি গিয়ে স্বস্তির সঙ্গে অনুভব করলাম অমঙ্গলের প্রভাব আমার উপর থেকে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম আমার ঠিক সামনেই একটা সরাইখানা। এতক্ষণ

আমি যেটার প্রত্যাশায় ছিলাম। এ যেন নির্বান্ধব দেশে এক পরম বন্ধুর আবির্ভাব। অবশ্য সরাইখানাটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা। কিন্তু যেমন করে হোক নিশ্চয় মালিককে জাগাতে পারব। ভালো খাবারের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম, অমঙ্গলের আশঙ্কা ইতিমধ্যে দূর হয়ে গেছে। সরাইখানাটা একটা ঝোঁপের আড়ালে থাকায় এতক্ষণ চোখে পড়েনি।

সরাইখানাটা বেশ বড়ই বলা চলে। তবে একটু সেকেলে ধরনের। একটা রঙ করা সাইন চোখে পড়ল। অন্ধকারে লেখাটা পড়া সম্ভব হলো না। আমার কাছে যদিও কোনো কিছু অস্বাভাবিক ঠেকল না। তবু দেখলাম, কুয়াশায় পুরো এলাকাটা ঢাকা থাকলেও সরাইয়ের বাগানে কিন্তু মোটেই কুয়াশা নেই।

বাইক যেখানে আছে সেখানে রেখেই দরজায় গিয়ে নক করলাম। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। দরজায় আবার নক করে আশপাশে একটু ভালো করে তাকালাম। দেখলাম সরাইয়ের দেয়ালে রোদে জলে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া একটা ছবি। ছবিতে একটা কফিন আঁকা। চারটে মুণ্ডুহীন মানুষ কফিনটা বহন করছে। তার নিচে লেখা-পথের শেষ প্রান্ত।

বুঝলাম সরাইয়ের মালিকের মধ্যে বেশ রসবোধ আছে। ছবিটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম, এমন সময় সরাইয়ের ভেতর হঠাৎ একটা শব্দ পেলাম। আর ডান দিকের জানালায় ক্ষীণ আলোর আভাস চোখে পড়ল আমার। কিছুক্ষণ পর আর সেই আলো দেখা গেল

না। বুঝলাম আমার নক করাটাকে ওরা মনের ভুল ভেবে ফিরে যাচ্ছে। ভাবছি এবার প্রচণ্ড জোরে দরজায় ঘা দেব। এমন সময় একটা অস্ফুট শব্দ আমার কানে এল। কে যেন চটি পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। খিল খোলার শব্দ হতেই ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল।

যাকে সামনে দেখলাম সে মানুষটি ছোটখাটো। মুখ গোলাকার। তাতে দাড়ি গোঁফ বা ভ্রুর বালাই নেই। মাথায় পুরোনো আমলের টুপি। গায়ে একটা লম্বা কালো পোশাক। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার, লোকটার চোখ বলতে কিছু নেই। দুহাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে আসছে।

এ পর্যন্ত বলে শিউরে উঠল মেথুয়েন। ডাক্তার খানিকটা এগিয়ে বসলেন। বললেন, তারপর? বলে যান।

তার পাশে এক মহিলা একটা মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ করলাম। মহিলাটি মাঝারি গড়নের। অপূর্ব সুন্দরী। কালো ভ্রু। বড় বড় দুচোখে এক আশ্চর্য জ্যোতি। আমাকে সে লক্ষ করছিল।

আমার অসুবিধার কথা জানিয়ে আশ্রয় চাইলাম। আমার গলার স্বর শুনে চক্ষুহীন, লোকটি হাত বাড়িয়ে আমার মুখ স্পর্শ করতে লাগল। ভাবলাম এ লোকই হয়তো সরাইখানার মালিক।

আমার মুখে হাত দেওয়াতে বেশ বিরক্তি লাগল। মহিলাটি বুঝতে পেরে তাকে বলল ওকে আসতে দাও, একে দিয়ে বেশ চলবে। একথা শুনে সরাইয়ের মালিক সরে দাঁড়িয়ে আমাকে হাতের ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বলল।

আবার থামল মেথুয়েন। বিশ্বাস করুন, যদি আমি তখন কাছাকাছি অন্য কোনো আশ্রয় পেতাম, এমনকি কোনো মুরগির ঘর বা গোলাবাড়িও থাকত সেখানেই রাত কাটাতাম। এক মুহূর্তও ওই সরাইখানায় থাকতাম না। ডাক্তার সাটন মাথা নেড়ে সায় দিলেন মেথুয়েনের কথায়। মেথুয়েন আবার শুরু করল–কিন্তু আমি তখন নিরুপায়। ওরা যে আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে

এই ভেবে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হলো। মালিক আমার মধ্যে যতই আতংকের সৃষ্টি করুক। জলা এলাকার বাইরে রাত কাটানোর চেয়ে তা অনেক ভালো।

মহিলাটি আমাকে কোনো কথা না বলে দোতলায় একটা শোবার ঘরে নিয়ে গেল। কিছু খাবার আর গোসল করতে চাইলে সে নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। ভাবলাম, সে ক্লান্ত। তাই এ নিয়ে কিছু বললাম না। এবং এভাবে রাতের বেলায় তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। তারপর তাকে শুভরাত্রি জানালাম। তাতে সে রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমি ঘরে একা রয়ে গেলাম।

ভালো করে লক্ষ করলাম ঘরটা। বিশেষ কোনো ফার্নিচারের বালাই নেই। ঘরের এক কোণে একটা বেসিন, তোয়ালে, আর দেয়াল বরাবর গোটা দুয়েক চেয়ার। আর একটা দেয়ালে খুব বড় একটা ওক কাঠের সিন্দুক। ঘরের একদিকে একটা খাট, আর অন্য দিকটায়। একটা ছোট দরজা ছাড়া আর কিছু নেই। দরজাটা খোলার চেষ্টা করলাম। ব্যর্থ হলাম। চাবির গর্ত দিয়ে তাকিয়ে অন্ধকারে ওপাশে কিছুই দেখতে পেলাম না। যা হোক, আমি ক্লান্ত, এবার ঘুমোব। পোশাক। ছাড়তে শুরু করলাম। একটা প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের বাতি ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই। বাতিটা জানালার কাছে একটা টেবিলের ওপরে। এত ভারী যে ওটাকে টেবিলে রাখতে মনে হয় তিনজন লোকের দরকার হয়েছিল। সেটার আলোও অস্পষ্ট। পোশাক ছাড়তে ছাড়তে মনে হলো সুন্দরী মহিলা চক্ষুহীন দৈত্যটার স্ত্রী নয়তো? তাই যদি হয় তাহলে তার জীবন নিশ্চয় অনেক কষ্টের। এমন এক লোকের সঙ্গে এমন নির্জন জায়গায় বাস করার এত শাস্তি তাকে কি অপরাধে ভোগ করতে হচ্ছে কে জানে। যখন শুতে যাব, তখন আবার গোসলের ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল।

আবার একবার দেয়ালের ছোট দরজাটার কাছে এগিয়ে গেলাম। দরজায় তালা দেওয়া। আমার কাছে সব সময়ই কিছু পুরোনো চাবি থাকে, যদি কখনো কাজে লাগে। এক্ষেত্রে কাজও হলো, খোলা গেল দরজাটা। আহ কি স্বস্তি গোসল করতে পারব। বাতির খোঁজ করলাম, কারণ অত বড় বাতিটা নিয়ে আসা অসম্ভব। কিন্তু পেলাম না। অগত্যা অন্ধকারেই গোসল করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কল ছেড়ে দিলাম। শোবার ঘর থেকে যা সামান্য আলো আসছে তাতে দেখলাম, পানিতে আয়রন বেশি থাকার জন্যই বেশ কালো দেখাচ্ছে। অথবা অব্যবহারের ফলেই মরচে পড়ে পানির এই রঙ। টবটা লোহার, অত্যন্ত পুরোনো আমলের।

আমি টবে নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। হায় ঈশ্বর। একি? টবটার চারপাশ আর তলাটা রক্তে পিচ্ছিল। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে এলাম। তারপর বোধহয় মুহূর্তের জন্য আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

জ্ঞান ফিরলে লক্ষ করলাম আমি টবটার পাশে শুয়ে আছি। জমে থাকা রক্তে আমার পা আর গোড়ালি লাল হয়ে গেছে।

আমার নিশ্চিত ধারণা হলো এ রক্ত মানুষের। গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম। যখন বিছানার ফিরে যাবার শক্তি পেলাম, প্রথমেই রক্ত মুছে ফেললাম। রক্ত মোছার পর একটু সুস্থ বোধ করলাম। পুরো ব্যাপারটা শান্তভাবে ভাবতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই এ সম্ভব বলে মনে হলো না। তবে রক্তের যে চিহ্ন তোয়ালেতে রয়েছে তাতে একে স্বপ্ন বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সত্য এবং অত্যন্ত ভয়ংকর।

কতক্ষণ বসে থেকে মন সংহত করার চেষ্টা করেছিলাম জানি না, হতে পারে। পাঁচ মিনিট, তবে মনে হলো অনন্তকাল। শেষ পর্যন্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমি পোশাক

পরতে শুরু করলাম। পাশের ঘরেই সেই মূর্তিমান আতঙ্ক। একথা জানার পর আর ঘুমানো সম্ভব নয় এবং ওই বাথরুমেই যে দেহটা কোথাও লুকানো আছে তাতে সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই তার শরীরের সমস্ত রক্ত নিমিষে নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। যেন প্রকাণ্ড কোনো জোক তার সব রক্ত শুষে নিয়ে ওই টবে রেখেছে।

হ্যাঁ, জোঁক, জোকই বটে-অন্ধ সরাইয়ের মালিককে জোঁকের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কে ওর পরবর্তী শিকার হতে চলেছে? শিউরে উঠল শরীর। দৌড়ে জানালার কাছে গেলাম। না ওই পথে পালানো অসম্ভব। কারণ এতক্ষণ যা আমার দৃষ্টি এড়িয়েছিল তা চোখে পড়ল। জানালার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত রয়েছে অত্যন্ত মজবুত ছটা লোহার শিক। দৌড়ে গেলাম দরজার কাছে। সেটাও তালা দেওয়া। অর্থাৎ, আমি বন্দী।

কী করব ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় আবার সিঁড়ি দিয়ে ভেসে এল চটির আওয়াজ। আওয়াজটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। থামল দরজার সামনে।

বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছি। প্রায় নিঃশব্দে দরজায় চাবি পড়ল, একটু একটু করে দরজাটা খুলে গেল। মহা আতঙ্কে সব শক্তি হারিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুক ধড়ফড় করছে, শিরা দপদপ করছে। কী ভয়ংকর সেই স্তব্ধতা।

হঠাৎ আমি বাকশক্তি ফিরে পেলাম, চিৎকার করে উঠলাম–যাও, চলে যাও বলছি। তারপর দরজাটার উপর ছিটকে পড়ে সেটা বন্ধ করে দিলাম। সেই আতঙ্কের মধ্যেও

শুনতে পেলাম পায়ের আওয়াজ ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার নিস্তব্ধতা। ভয় পাবার জন্য ধিক্কার দিলাম নিজেকে। কেন যে সেই অন্ধ, মূর্তিমান আতঙ্কের মাথায় ঘিলু উড়িয়ে দেইনি। তাহলেই তো পালাতে পারতাম। আসলে ওকে দেখেই আমার সারা শরীর অবশ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আমি সাহস সঞ্চয় করে খুললাম দরজাটা। মনে ভয় জাগানোর এত গাঢ় অন্ধকার। ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেব তাও অসম্ভব। কারণ চাবিটাই নেই।

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে গেলাম ঘরের অন্য প্রান্তে, চেষ্টা করলাম প্রকাণ্ড সিন্দুকটাকে সরাতে। বেশ পরিশ্রমের পর কোনো রকমে তা করা গেল। সেটাকে দরজার সঙ্গে আটকে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এখন আর কিছু করার নেই। শুধু ভোরের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া। আমি আলো না নিভিয়েই শুয়ে পড়লাম।

মনে মনে ঠিক করলাম পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করব। অলসভাবে চিত হয়ে শুয়ে আছি, হঠাৎ দেখি, ঠিক আমার মুখের সামনে একটা বিরাট মাকড়সা একটা সুতোয় ভর করে ঝুলছে। মাকড়সাই একমাত্র আমার মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে। সেই মাকড়সাটা সুতো ধরে ঝুলছে না। ভালো করে লক্ষ করলাম, একটা খুব সরু ধাতব পদার্থ বেয়ে নেমে আসছে ওটা।

এক দৃষ্টিতে মাকড়সাটার দিকে তাকিয়ে আছি। চেষ্টা করছি জেগে থাকতে। কিন্তু ক্লান্ত শরীর আর তা মানল না। ঘুমিয়ে পড়লাম এক সময়।

হঠাৎ অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে গেল। সরসর করে কী যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে গায়ের ওপর। চাপা আর্তনাদের সঙ্গে পলকের মধ্যে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে এলাম। আর সেই মুহূর্তেই সেই সুচালো অত্যন্ত ভারী ধাতব বস্তুটা যেটা থেকে মাকড়সাটা ঝুলছিল সেটা ভয়ংকর বেগে পড়ল ঠিক যেখানে আমি শুয়ে ছিলাম সে জায়গায়। আমার গায়ে সেই মাকড়সাটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বলতে কি, মাকড়সাটার জন্যই আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম।

বেশ অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে আমি মাকড়সাটাকে শরীর থেকে ঝেড়ে ফেললাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কি হয়েছিল। ধাতব সুচালো বস্তুটা হচ্ছে একটা বর্শার এত বস্তুর একাংশ, ছাদের একটা গর্তের ওপর তার বাকি অংশটা অদৃশ্য। মানুষ খুনের জন্য শয়তানি বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা।

ভাগ্যের জোরেই বেঁচে গেলাম সে যাত্রা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করা যায়। এমন সময় মনে হলো যেন দরজার বাইরে থেকে আঁচড়ানোর আওয়াজ আসছে। না, এ আমার উত্তেজিত স্নায়ুর ভুল শোনা। তবু কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর বিছানার পাশের দেয়ালের ওপার থেকে যে মৃদু আঁচড়ের আওয়াজ আমার কানে এল সেটা যে বাস্তব তাতে সন্দেহ রইল না।

ফিরলাম সেদিকে। দেয়ালটার একটা ফাটল একটু একটু করে স্পষ্ট হলো। তারপর সেই ফাটল দিয়ে অস্পষ্ট আলো দেখা গেল।

তাড়াতাড়ি নিভিয়ে দিলাম বাতিটা। ঠিক করলাম এবার আর আমল দেব না ভয়। মরিয়ার সাহস নিয়ে আমি বাথরুমে গিয়ে দরজাটা ফাঁক করে দেখতে। লাগলাম, নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল রেখে। দেখলাম সেই ফাঁক ক্রমেই বড় হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সরাইয়ের মালিক ঢুকে পড়ল সেখান দিয়ে। মুহূর্তের জন্য থেমে দাঁড়াল। তারপর হাতড়াতে হাতড়াতে, নিশব্দে, আন্দাজ করে করে আমার বিছানার দিকে এগোল, এবং হাতড়াতে হাতড়াতে ধাতব বস্তুটি অনুভব করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে দেহটা খুঁজতে ব্যস্ত হলো। ভদ্রমহিলাও তার পিছু পিছু এগোচ্ছিল। সরাইয়ের মালিককে হতাশাব্যঞ্জক আওয়াজ করতে দেখেই সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলল। বলে উঠল বাথরুমটা, বাথরুমটা, তাড়াতাড়ি। তারপর কিছুটা টেনে, কিছুটা ঠেলে চক্ষুহীন দানব দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পলকের মধ্যে আমি সেখান থেকে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলাম। টবের উপরের চৌবাচ্চাটার ওখান দিয়ে একটু তারার আলো চোখে পড়ল। বিদ্যুতের বেগে আমি উঠে পড়লাম সেখানে। ওখানে শুয়ে হাঁপাতে লাগলাম। একটা বিকট দুর্গন্ধ নাকে আসছে। তবুও আমি নড়াচড়া করতে সাহস পেলাম না। একটু পরেই বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল। আততায়ীরা প্রবেশ করল। আমাকে দেখতে পাবে নাকি ওরা? মনে মনে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করলাম। কী যেন বলে মহিলাটি ঝুঁকে পড়ল। তারপর টবের ভেতর থেকে আন্দাজে একটা কুড়াল তুলে নিয়ে বীভৎস হাসি হেসে উঠল। যেন কোনো বন্যজন্তু মাংসের গন্ধ পেয়েছে।

চেঁচিয়ে আমাকে বলল, নেমে আসুন বলছি, আমার ভাড়া মিটিয়ে যান। তবু আমি চুপচাপ রয়ে গেলাম দেখে মোমবাতিটা অন্ধের হাতে দিয়ে বেয়ে উঠতে শুরু করল।

এক মুহূর্ত দেরি না করে কনুই দিয়ে কাঁচ ভেঙে ফেললাম। বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। এমন সময় মহিলাটিও উঠে এল। হিংস্র বাঘিনীর মতো এগিয়ে আসছে সে।

ঠিক তখনই আমি পা পিছলে পড়ে গেলাম। হাতে আর পায়ে নরম পদার্থের ছোঁয়া পেলাম। তাকালাম নিচে। আতংকের উপর আতংক। একরাশ গলিত মৃতদেহের উপর আমি পড়ে গেছি। নারী আর পুরুষের অসংখ্য লাশ সেখানে। কোনোটা কাটা গলার, কোনোটা আবার তখনো সেই অবস্থায় পৌঁছায়নি। বুঝলাম এরা সবাই সরাইখানার আতিথ্য গ্রহণ করেছিল।

কোনোরকম সেখান থেকে উঠে ছাদের ঢালু টালির উপরে নামলাম। ফিরে দেখি, মহিলাটিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে সেই স্কাইলাইট দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এ । জায়গায় একটা গাছের ডাল চোখে পড়ল। যা ধরে নিষ্কৃতি মিলতে পারে। ডালটা প্রায় ধরেছি এমন সময় আমার পা পিছলে গেল। আরেকটু হলেই সর্বনাশ হতো। আমি প্রাণপণে ডালটা চেপে ধরে ঝুলতে থাকি। এখন যদি পড়ে যাই হাত পা ভাঙবে, ধরাও পড়ব। ধরা পড়া মানেই মৃত্যু।

একটু পরেই লক্ষ করলাম মহিলাটি উল্লসিত চিৎকার করে উঠল। মহা আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করলাম সে কুড়ালটা দোলাচ্ছে। পরমুহূর্তেই ডান হাতে একটা ভয়ংকর আঘাত অনুভব করলাম। বুঝতে পারলাম আমি নিচে পড়ে যাচ্ছি। যাই হোক, এই অবস্থাতেও কোনো মতে উঠে দৌড়ে পালাতে লাগলাম।

রাতের আঁধারে কতক্ষণ দৌড়েছি জানি না। শেষ পর্যন্ত যখন পেছন ফিরে দেখলাম কেউ তেড়ে আসছে কিনা, দেখলাম যেখানে সরাইটা ছিল পুরো জায়গাটা জুড়ে ওখানে জ্বলছে আগুন। সেই আগুনে অন্ধকার আকাশ আলোকিত।

মেথুয়েনের কাহিনি শেষ হলো। তার কপালে ঘামের বড় বড় বিন্দু ফুটে উঠেছে। যেন কাহিনির বর্ণনা করতে যে সে আবার ঘটনাস্থলে চলে গেছে।

ডাক্তার বললেন, অত্যন্ত ভয়ংকর কাহিনি। শেষ পর্যন্ত সরাইখানায় আগুন লেগে গেল। কিন্তু কিভাবে?

আমার ধারণা মহিলা যখন অন্ধ লোকটাকে মোমবাতি ধরতে দিয়েছিল তখন সেই আগুন কোনো দাহ্য পদার্থে লেগে যায়। তারপর সেই আগুন সবখানে ছড়িয়ে পড়ে, বলল মেথুয়েন।

আপনি দিব্যি সব বুঝিয়ে দিতে পারেন দেখছি। ঠাট্টার সুরে বললেন ডাক্তার।

মেথুয়েন উঠে চেয়ারটার পেছনে গেল। তার মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাশে। ডাক্তারের দিকে ফেরার আগে সে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য চেয়ারের হাতলটা বাঁ হাতে চেপে ধরল। তারপর বলল, তাহলে আপনি ভাবছেন আমি পাগল? তাই যদি হয়, তাহলে এটার কী ব্যাখ্যা দেবেন? এই বলে সে চট করে পকেট থেকে কাটা ডান হাতটা বের করল। সে হাতের চারটে আঙুল নেই। শরীরের সাথে। হাতের কাটা বাকি অংশে ব্যান্ডেজ করা। চটচটে রক্তে মাখা সেই ব্যান্ডেজ। মেথুয়েন ভারসাম্য না রাখতে পেরে পড়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার সাটন ধরে ফেললেন তাকে।

সে এসেছিল – আলজারনন ব্ল্যাকউড

রাত এগারোটা। লন্ডন শহরের এডিনবার্গ অঞ্চলের রাস্তাঘাট নির্জন, নিস্তব্ধ। পথে লোকজনের যাতায়াত খুবই কম। রাস্তার ধারের এক হোস্টেলের চারতলায় থাকে ম্যারিয়ট। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সে। এই হোস্টেলে তার মতো কিছু ছাত্র এবং সাধারণ কেরানি চাকরিজীবী থাকে।

ম্যারিয়ট মন দিয়ে পড়া মুখস্থ করছে। দরজায় খিল লাগানো। সে বেশ কয়েকবার পরীক্ষায় ফেল করায় তার বাবা-মা হুমকি দিয়েছেন-এটাই তার শেষ সুযোগ। আর তারা টাকা পয়সা খরচ করতে পারবেন না। ম্যারিয়ট সেকথা মনে রেখেই এবার জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে যাচ্ছে-এবার তাকে পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে কারণ তাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সে এরকম নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করে যাচ্ছে। তার পরিচিতরা ব্যাপারটা জানত তাই তার পড়ার কোনো ব্যাঘাত ঘটাত না।

হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। এত রাতে বেল বাজার শব্দে ম্যারিয়ট অবাক হলো। এত রাতে কে এল?

বাড়িওয়ালি রোজ ঠিক রাত দশটার সময় খাওয়াদাওয়া সেরে শুতে যায়। এরপর দরজায় বেল বাজলে সে না শোনার ভান করে। ম্যারিয়ট ভাবল আগন্তুকের আসার

উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তাকে বিদায় করে দেবে। তাই সে দরজা খোলার জন্য টেবিল ছেড়ে উঠল।

পাথর বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ম্যারিয়ট আবার বেল বাজানোর শব্দ শুনতে পেল। রাগ ও বিরক্তির সঙ্গে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এল। দরজা খুলে বলল, সব্বাই জানে আমি পরীক্ষার পড়া তৈরি করছি আর এই অসময়ে এসে কেন বিরক্ত করা হচ্ছে?

বই হাতে ম্যারিয়ট দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আপন মনে বকে যাচ্ছিল। কিন্তু আগন্তুক কই! জুতোর খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে এত কাছে এবং এত জোরে যে মনে হচ্ছে পা দুটো যেন আগে আগে আসছে। আগন্তুক যেই-ই হোক না কেন অসময়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য তাকে কড়া কথা শোনাতে ম্যারিয়ট রেডি হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ সে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু আগন্তুকের দেখা নেই। পায়ের শব্দটা খুব কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে, তবে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

এবার ভয়ে তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। একবার ভাবল চিৎকার করে অদৃশ্য আগন্তুকটিকে ডাকবে তারপর ভাবল না; দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে আবার ওপরে গিয়ে পড়ায় মন দেবে। এই সব সাতপাঁচ ভাবছিল ম্যারিয়ট। হঠাৎ সেই জুতোর শব্দটা একেবারে কাছে শোনা গেল এবং আগন্তুককে দেখা গেল।

আগন্তুক বয়সে তরুণ, বেঁটে, খাটো, মোটা। মুখটা চুনের এত সাদা, উজ্জ্বল চোখ দুটোর তলায় কালি পড়েছে। একমুখ দাড়ি, চুল আলুথালু আর পোশাকের। পরিপাট্য দেখে তাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হলো ম্যারিয়টের। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার তার মাথায় কোনো টুপি নেই এমনকি গায়ে ওভারকোট বা হাতে ছাতাও নেই। অথচ সন্ধ্যে থেকেই অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

লোকটিকে দেখে ম্যারিয়টের মনে নানারকম প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল। তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল-কে আপনি? আর কেনই-বা এত রাতে এখানে এসেছেন? রাস্তার গ্যাসের আলো তার মুখের ওপর পড়ল। চমকে উঠল ম্যারিয়ট। চিনতে পারল আগন্তুককে। ফিল্ড! ফিল্ড, তুমি বেঁচে আছ? ভয়ে ম্যারিয়টের দমবন্ধ হবার জোগাড় হলো।

ম্যারিয়ট এই ফিল্ডের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত। সে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তাই-ই হয়েছে। তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পরে একবারই মাত্র দেখা হয়েছিল। ম্যারিয়টের বাড়ির কাছেই ফিল্ড থাকত তাই তার বোনদের মারফত সব খবরই ম্যারিয়ট পেত। ফিল্ড অসংযত জীবনযাপন করত, মদ, আফিং, চরসের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত। সে একেবারে উচ্ছন্নে চলে যায়।

ম্যারিয়টের রাগ-বিরক্তি মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। সে তাকে ভেতরে আসতে বলল। বলল, মনে হচ্ছে কিছু ঘেট পাকিয়েছ। এসো ভেতরে, সব শুনছি। আমাকে সব খুলে বলো– হয়তো আমি কোনো সাহায্য...আর কি বলবে ম্যারিয়ট ভেবে পেল না, শুধু সে তো তো

করতে লাগল। তারপর নিজেকে সংযত করে, সদর দরজাটা বন্ধ করে বন্ধুকে নিয়ে হলের দিকে এগোল। ফিল্ড খুব পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত। তার টলায়মান পা দুটো দেখলেই বোঝা যায়। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন সে কিছু খায়নি।

ম্যারিয়ট এবার হাসিমুখে সমবেদনার স্বরে বলল–আমার সঙ্গে এসো, তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। এইমাত্র আমি খেতে যাচ্ছিলাম, তুমি ঠিক সময়েই এসেছ।

ফিল্ডের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে এতই দুর্বলভাবে হাঁটছিল যে ম্যারিয়ট তার হাতটা ধরে নিয়ে চলল। এই প্রথম সে লক্ষ করল ফিল্ডের জামা কাপড় তার গায়ে মোটেই ফিট করেনি। খুব ঢিলেঢালা লাগছে। তার বিরাট চেহারাটা কঙ্কালসার।

ফিল্ডকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সোফাতে বসালো ম্যারিয়ট। আশ্চর্য হচ্ছিল ভেবে কোথা থেকে ফিল্ড এল আর কী করেই-বা সে তার ঠিকানা জানল।

ম্যারিয়ট বলল, ফিল্ড, তুমি সোফায় বিশ্রাম করো কিছুক্ষণ, তুমি খুব ক্লান্ত। পরে তোমার কাছে সব শুনব। তখন দুজনে মিলে যা হোক একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

ফিল্ড সোফায় বসে কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ম্যারিয়ট আলমারি থেকে বাদামি রঙের পাউরুটি, কেক এবং একটা বড় পাত্রে কমলালেবুর আচার বের করল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ফিল্ডের চোখ দুটো ভীষণ চকচক করছে। ম্যারিয়ট ভাবল

এটা নিশ্চয়ই কোনো ওষুধের প্রভাব। ওর অবস্থা খুবই শোচনীয়। কথা বলবার শক্তিও বোধহয় তার নেই।

ম্যারিয়ট কোকো তৈরি করার জন্য স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালাল। পানি যখন ফুটছে তখন খাবার টেবিলটা সোফার কাছে টেনে নিয়ে এল যাতে ফিল্ডের চেয়ারে উঠে গিয়ে বসতে কষ্ট না হয়। এসো, এখন খাওয়া যাক। বলল ম্যারিয়ট। তারপর পাইপ টানতে টানতে গল্প করব। এবার পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। যদিও খুব ব্যস্ত এখন আমি, তবুও তোমার এত বন্ধুকে কাছে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে।

ম্যারিয়ট আবার ফিল্ডের দিকে তাকিয়ে দেখল তার অতিথি বন্ধুটি তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ম্যারিয়টের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শিহরন বয়ে গেল। ফিল্ডের মুখ মরার মতো ফ্যাকাসে। ব্যথা ও মানসিক কষ্টের একটা ছাপ তার মুখে ফুটে উঠেছে।

এইরে! ম্যারিয়ট লাফিয়ে উঠল। একেবারে ভুলেই গেছিলাম। বলে আলমারি থেকে মদের বোতল আর গেলাস বার করল। গেলাসে মদ ঢেলে ফিল্ডকে দিল। ফিল্ড পানি না মিশিয়ে সেটা এক ঢোকে শেষ করল। ম্যারিয়ট লক্ষ করল ফিল্ডের কোটটা ধুলোয় ভর্তি, কাঁধে মাকড়সার জাল। কোটটা শুকনো খটখটে। বৃষ্টি ঝরা রাতে ফিল্ড এসেছে-টুপি, ছাতা, ওভারকোট কিছুই নেই-অথচ শুকনো, এমনকি ধুলোভর্তি! ব্যাপারটার অর্থ কিছুতেই মেলাতে পারছিল না ম্যারিয়ট। তবে কি ফিল্ড এই বাড়িতেই কোথাও লুকিয়েছিল?

তবু ম্যারিয়ট কিছুই জিজ্ঞেস করল না। ঠিক করেছে, ফিল্ডের খাওয়া ও ঘুম হওয়া পর্যন্ত তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবে না। খাবার এবং ঘুম-দুটোই এখন তার খুবই প্রয়োজন। একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ফিল্ডকে কিছু জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না।

তারা দুজনে খেতে লাগল। ম্যারিয়ট একাই কথা বলে যাচ্ছে। তার নিজের সম্বন্ধে, তার পরীক্ষার ব্যাপারে, বুড়ি বাড়িওয়ালির কথা-একনাগাড়ে বলেই চলেছে। ম্যারিয়টের খাবার কোনো ইচ্ছা নেই, হাতে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। যদিও ফিল্ড গোগ্রাসে গিলছে। একজন ক্ষুধার্তের এভাবে ঠান্ডা, বাসি খাবার খাওয়ার আগ্রহ দেখে ম্যারিয়ট ভাবছিল, ফিল্ডের গলায় আবার খাবার আটকে না যায়!

কিন্তু ফিল্ড যেমন ক্ষুধার্ত ছিল তেমনি তার ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়ছে, মুখের খাবার চিবোনো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ম্যারিয়ট বারবার তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে রাখছিল। আর ফিল্ড পশুর এত গরগর করে খাবার মুখে পুরে সরু গলনালি দিয়ে গিলে ফেলছে।

শেষ কেকটি ফিল্ড গলাধকরণ করার পর বোকার মতো ম্যারিয়ট বলল-তোমাকে দেবার মতো আমার আর কিছুই নেই।

ফিল্ড কিছুই বলল না। তার নিজের জায়গায় প্রায় ঘুমিয়ে পড়ার দশা। ক্লান্ত ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে একবার চোখ তুলে দেখল।

এখন তোমার একটু ঘুমের দরকার, নইলে শরীর খারাপ করবে। আমাকে সারা রাত জেগে পড়াশোনা করতে হবে। আমার বিছানায় তুমি আরাম করে শোও। কাল একটু বেলাতে ব্রেকফাস্ট করব কেমন, আর-আর দেখি কি করা যায়। ঘরের গুমোট পরিবেশ হালকা করার জন্য ম্যারিয়ট বলল।

ফিল্ড যেন মৃত্যুর নীরবতা পালন করে চলেছে। তার মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে ম্যারিয়ট তাকে নিজের ছোট শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ফিল্ড জমিদারের ছেলে। তাদের বিশাল অট্টালিকা। তার কাছে এই ছোট সামান্য ঘরটা নেহাতই পুতুলঘরের মতোই।

ক্লান্ত ফিল্ড কোনো ধন্যবাদের ধার না ধেরে কিংবা ভদ্রতার ভান না করে বন্ধুর হাতে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে ঘরে ঢুকল। ম্যারিয়ট তাকে তার গায়ের পোশাকসুদ্ধ বিছানায় শুইয়ে দিল।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ম্যারিয়ট তার আপাদমস্তক দেখল। পরমুহূর্তেই তার চিন্তা হলো, এই অনাহুত অতিথিকে নিয়ে কাল সে কি করবে? কিন্তু বেশিক্ষণ এ ভাবনা তাকে উতলা করতে পারল না, কারণ পরীক্ষার টেনশনটা তাকে বড় খোঁচাচ্ছে।

দরজায় খিল লাগিয়ে সে আবার পড়তে বসল বই নিয়ে। মেটিরিয়া মেডিকার যেখান থেকে নোট করতে করতে কলিংবেল শুনে উঠে গিয়েছিল, সেখানে আবার মনোনিবেশ করল। কিন্তু সে বেশ খানিকক্ষণ মনোসংযোগ করতে পারল না। তার চিন্তা কেবলই সেই মূর্তিটিতে ঘুরপাক খাচ্ছে-সাদা ফ্যাকাসে মড়ার মতো মুখ, অদ্ভুত জ্বলন্ত চোখ, ক্ষুধার্ত ও মলিন বেশ, পোশাক ও জুতো পরে ফিল্ডের বিছানায় শুয়ে থাকা।

হঠাৎ ম্যারিয়টের একটা শপথের কথা মনে পড়ে গেল। ইস্ একেবারে ভুলে গিয়েছিল!

ম্যারিয়ট আধখোলা দরজা দিয়ে ছোট শোবার ঘরটা থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষের গভীর নিদ্রা তাকেও বিছানার দিকে আকর্ষণ করছিল।

ম্যারিয়ট ভাবছে, একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক, খুব ঘুম পাচ্ছে।

তখন বাইরে সোঁ সোঁ শব্দে ঠান্ডা বাতাস বইছে; সার্সিতে এবং রাস্তায়। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ম্যারিয়ট পুনরায় পড়ায় মনোসংযোগ করার চেষ্টা করল; কিন্তু বই পড়তে পড়তে সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল পাশের ঘরের লোকটির ভারি ও গভীর নিশ্বাস!

প্রথমে, হয় ঘরের অন্ধকারে সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। নয়তো, আলোয় এতক্ষণ বসে থাকার কারণে তার চোখ ধাধিয়ে গিয়েছিল। কিছুই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না-

আসবাবগুলো কালো ঢেলার মতো, দেয়ালে ড্রয়ারের আলমারিটা একটা কালো বস্তু, ঘরের মাঝখানে সাদা বাথটাবটা যেন একটা সাদা প্রলেপ।

তারপর ধীরে ধীরে বিছানার দিকে তাকাতেই দেখল তার ওপর একটা ঘুমন্ত দেহের রেখা ক্রমে ক্রমে আকার নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুতভাবে সে বাড়তে লাগল। পরিষ্কার দেখা গেল বিছানার সাদা চাদরের ওপর একটা লম্বা কালো মূর্তি।

মনে মনে হাসল ম্যারিয়ট। ফিল্ড একটুও নড়েনি। কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখে ম্যারিয়ট আবার বইয়ের কাছে ফিরে এল।

একটানা বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে। বাইরে গাড়ির কোনো শব্দ নেই, তবে দুধের গাড়ি চলার সময় এখনো হয়নি। ম্যারিয়ট পড়তে লাগল। ঘুম আসছিল বলে মাঝে মাঝে ঘুম তাড়াবার জন্য কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। তারই মধ্যে ফিল্ডের গভীর নিশ্বাস তার কানে আসছে।

বাইরে তখনো ঝড় থামেনি। সঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি। ঘরের মধ্যে নিঃসীম নিস্তব্ধতা। টেবিল ল্যাম্পের আলো টেবিলে ছড়িয়ে আছে বাকি ঘরের সবটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ছোট শোবার ঘরটা-যেখানে ফিল্ড শুয়ে আছে সে যেখানে বসে আছে ঠিক তার উল্টোদিকে, তার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাবার মতো কিছুই নেই, তবে মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাঁপটা জানালার ওপর পড়ছে আর হাতে সামান্য একটু ব্যথা অনুভব করছে।

এই ব্যথাটা যে কী করে হলো তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, বেশ টনটন করছে। ম্যারিয়ট মনে করার চেষ্টা করছে, কেমন করে, কখন এবং কোথায় তার হাতে ধাক্কা লেগেছিল কিন্তু কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

নিচে রাস্তায় গাড়ির শব্দে সে সম্বিৎ ফিরে পেল। ঘড়ির দিকে তাকালো। ভোর চারটা। ম্যারিয়ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বিরাট হাঁ করে হাই তুলল। তারপর উঠে জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে দিল। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। বাইরে ঘন কুয়াশায়– দৃষ্টি চলে না। ব্রেকফাস্টের আগে সোফায় শুয়ে বাকি চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ম্যারিয়ট। কিন্তু তখনো সেই শোবার ঘরটা থেকে গভীর নিশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর একবার নিঃশব্দে আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভোরের মৃদু আলোয় বিছানাটা পরিষ্কার দেখতে পেল। বিছানায় কেউ নেই। একবার চোখটা কচলে নিল ভালো করে। অবাক বিস্ময়ে তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। বিছানা শূন্য, ঘরেও কেউ নেই।

ফিল্ডের প্রথম আবির্ভাবে যে ভয় ম্যারিয়টের মনে জেগে উঠেছিল সেই ভয় হঠাৎ যেন সে আবার অনুভব করতে লাগল। এবার যেন আরও বেশি। সেইসঙ্গে সে সচেতন হয়ে উঠল তার বাঁ হাতটা দপদপ, টনটন করছে, আরও বেশি সে যন্ত্রণা বোধ করছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ম্যারিয়ট। চিন্তা করার শক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছে। আপাদমস্তক ঠকঠক করে কাঁপছে।

অনেক চেষ্টায় সে মনে বল এনে সাহসের সঙ্গে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, বিছানার ওপরে যেখানে ফিল্ড শুয়ে ঘুমিয়েছিল সেখানে দেহের চাপ পড়ে একটা ছাপ তৈরি হয়েছে। বালিশে মাথা রাখার দাগ, নিচের দিকে বিছানার যেখানে বুটজুতো পরা পা রেখেছিল সেখানটা গর্ত হয়ে গেছে। আর সে বিছানার এত কাছে ছিল যে, পরিষ্কার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

ম্যারিয়ট হঠাৎ চিৎকার করে তার বন্ধুর নাম ধরে ডাকতে লাগল-ফিল্ড! তুমি কোথায়? তুমি কি বাথরুমে গেছ? কোথায় তুমি?

কোনো সাড়া নেই। বিছানা থেকে তখনো নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ম্যারিয়টের নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকছে। আর সে ডাকল না। হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার ওপরে নিচে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল। শেষে তোশক তুলে ফেলল, একটার পর একটা চাদর তুলে দেখতে লাগল। যদিও ফিল্ডকে দেখা যাচ্ছিল না তবু সে তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। দেয়ালের কাছ থেকে খাটটা টেনে নিয়ে এল তবু শব্দটা সেখান থেকে অবিরাম আসতে লাগল।

ক্লান্তিকর এ অবস্থায় ম্যারিয়ট মাথাটা ঠিক রাখার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বারবারই সে টালমাটাল হয়ে যাচ্ছিল। সামলাতে পারছিল না নিজেকে। সে তন্নতন্ন করে সমস্ত ঘর,

বাথরুম খুঁজে দেখল। কোথাও কারও চিহ্ন নেই। ঘরের ওপর দিকে ছোট জানালাটা বন্ধ। তবে ওটা বেড়াল যাবার মতোও চওড়া নয়। বসার ঘরের দরজাটা ভেতর দিক থেকে বন্ধ। সেপথ দিয়ে ফিল্ড বেরিয়ে যেতে পারে না। অদ্ভুত সব চিন্তা ম্যারিয়টের মনকে অস্থির করে তুলল। ভেতরটা তার তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। আবার সে বিছানা উল্টেপাল্টে ভালো করে দেখল। দুটো ঘর, বাথরুম আবার খুঁজে এল। না, কোথাও কিছু নেই। সে দরদর করে ঘামছিল। ঘরের কোণে বিছানায় যেখানে ফিল্ড শুয়েছিল সেখান থেকে তখনো নিশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছিল।

তখন সে অন্যভাবে চেষ্টা করল। খাটটা যেখানে ছিল, সেখানে টেনে এনে সেই বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে সে বিছানা ছেড়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিশ্বাসটা একেবারে তার মুখের ওপর পড়ছে

ম্যারিয়ট দ্রুত পড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে সবকটা জানালা খুলে দিল। ঘরে আলো হাওয়া খেলতে লাগল। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ধীরে সুস্থে চিন্তা করার চেষ্টা করল। সে জানত, যারা খুব বেশি পড়াশোনা করে এবং কম ঘুমোয়, তাদের মনে নানা অলীক, অবাস্তব চিন্তা জেগে উঠে যন্ত্রণা দেয়। আবার মনকে সে শান্ত করে রাতের ঘটনাগুলো পরপর বিশ্লেষণ করেও কোনো কূলকিনারা পেল না।

এসব খতিয়ে দেখে আর বিশ্লেষণ করতে করতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হঠাৎ তার মনে উদয় হলো। ফিল্ড কিন্তু একবারও মুখ দিয়ে একটাও শব্দ বার করেনি! তার ভাবনা

চিন্তাকে ঠাট্টা করার জন্য তখনো ভেতরের ঘর থেকে দীর্ঘ গভীর ও স্বাভাবিক নিশ্বাসের শব্দ আসছে! একটা অবিশ্বাস্য অযৌক্তিক ব্যাপার!

ভুতুড়ে চিন্তার জালে জড়িয়ে পাগলের মতো মাথায় টুপি ও গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে পড়ল। সকালের বিশুদ্ধ বাতাস, গাছগাছালির বুনো গন্ধ, আর স্যাঁতসেতে ভিজে মাটির ওপর ঘুরে বেড়িয়ে যখন সে বুঝতে পারল, মন থেকে ভয় দূর হয়েছে, খিদেও পেয়েছে বেশ, তখন সে বাড়ি ফিরে এল।

ঘরে ঢুকতেই দেখল একজন লোক জানালায় হেলান দিয়ে বসে আছে। তাকে দেখে ম্যারিয়ট প্রথমটায় চমকে উঠলেও পরে তাকে চিনতে পারল। এ তার বন্ধু গ্রিন-তার সঙ্গে পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

সে বলল, সারা রাত খুব পড়েছ, ম্যারিয়ট। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে নোটগুলো মিলিয়ে নিই, আর ব্রেকফাস্টটাও করি। তাই তোমার কাছে চলে এলাম। তুমি এত সকালে কোথায় গেছিলে? বাইরে?

ম্যারিয়ট বলল, মাথাটা ধরেছিল, তাই একটু বেড়িয়ে এলাম।

ও! গ্রিনের কণ্ঠে বিস্ময়। একজন পরিচারিকা ঘরে ঢুকে গরম গরম পরিজ টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। গ্রিন বলল, ম্যারিয়ট, তোমার মদে আসক্তি আছে। জানতাম না তো!

নীরস সুরে ম্যারিয়ট বলল সে নিজেও তা জানে না।

মনে হচ্ছে বিছানায় কেউ আরামে ঘুমিয়ে আছে, তাই না? মাথা নেড়ে ছোট শোবার ঘরটা দেখিয়ে কৌতূহলী হয়ে ম্যারিয়টের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুজনে কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে সাগ্রহে ম্যারিয়ট বলল, তাহলে তুমিও শুনেছ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

নিশ্চয়ই আমি শুনেছি। দরজা খোলা রয়েছে। আমি যে ঘরে ঢুকে পড়েছি তুমি কিছু মনে করোনি তো?

না, না। আমি কিছু মনে করিনি। ম্যারিয়ট নিচু স্বরে বলল, এখন আর আমার ভয় করছে না। আমি ব্যাপারটা বলি। ভেবেছিলাম আমার মাথায় কোনো গোলমাল হয়েছে। তুমি জানো, এই পরীক্ষার ওপর আমার অনেক কিছু নির্ভর করছে। অথচ আমি পড়ায় মন বসাতে পারছি না। সাধারণত কোনো শব্দ, দৃশ্য অথবা অলৌকিক চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকলে এমনটা হতে পারে কিন্তু আমি... বাজে যত্তসব!

তার কথার মাঝে হঠাৎ গ্রিন বলল, তুমি কিসের কথা বলছ?

শান্তস্বরে ম্যারিয়ট বলল, আমার কথা শোনো, গ্রিন। আমি যা বলতে চাই, পরপর বলে যাব-তুমি কোনো বাধা দেবে না। রাতে যা যা ঘটেছিল সবিস্তারে বলল ম্যারিয়ট। হাতের ব্যথার কথাটাও বাদ দিল না। বলা শেষ হলে টেবিল থেকে উঠে সে ঘরের ওপাশে গেল। বলল, এখন তুমি স্পষ্ট নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছ তো? তাই না?

গ্রিন ঘাড় নেড়ে বলল, হুঁ! বেশ, এবার এসো আমার সঙ্গে, আমরা দুজনে ভালো করে ঘরটা খুঁজে দেখব। গ্রিন কিন্তু চেয়ার থেকে নড়ল না! শুধু। নিষ্ক্রিয়ভাবে বলল, আমি আগেই ওখানে খুঁজে এসেছি। আমি শব্দ শুনে ভেবেছিলাম যে তুমি। দরজা হাট করে খোলা ছিল, তাই ভেতরে ঢুকেছিলাম।

ম্যারিয়ট কোনো মন্তব্য না করে দরজাটা ঠেলে একেবারে খুলে দিল। দরজাটা খুলতেই নিশ্বাসের শব্দটা আরও জোরে এবং পরিষ্কারভাবে হতে লাগল। কেউ নিশ্চয়ই ওখানে আছে। চাপা স্বরে গ্রিন বলল।

কেউ ওখানে আছে, কিন্তু কোথায়? ম্যারিয়ট বিস্মিত হয়ে বলল। আবার তার সঙ্গে ঘরে ঢোকবার জন্য জেদ ধরল। গ্রিন রাজি হলো না। বলল সে একবার ঘরে ঢুকে ভালো করে খুঁজে দেখেছে, কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পায়নি। অতএব, সে আর ভেতরে যাবে না।

ওরা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসার ঘরে ফিরে এল। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ম্যারিয়ট বলল, সঠিক এবং যুক্তিসংগত একমাত্র যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা হলো আমার হাতের ব্যথাটা। হাতটায় প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। কখন যে। চোট লেগেছিল কিছুই মনে করতে পারছি না।

গ্রিন বলল, দেখি তো তোমার হাত। ম্যারিয়ট কোটটা খুলে জামার হাতাটা গুটিয়ে ফেলল।

হায় ঈশ্বর! এ যে দেখছি রক্ত! সে চিৎকার করে উঠল। দেখো, দেখো, এটা কী?

হাতের কবজির কাছাকাছি একটা সরু লাল দাগ! তার ওপরে টাটকা রক্তের ফোঁটা। গ্রিন কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ সেটা খুঁটিয়ে দেখল। তারপর চেয়ারে বসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখ দেখতে লাগল। মন্তব্য করল অজান্তেই তুমি নখের আঁচড় কেটেছ।

কোনো চিহ্ন নেই তো! নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণে আমার হাতে এমন ব্যথা হচ্ছে।

ম্যারিয়ট নিশ্চল বসে একদৃষ্টে হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন সব রহস্যের সমাধান হাতের চামড়ার ওপর লেখা আছে।

কি ব্যাপার? একটা আঁচড়ে অদ্ভুত কিছু আমি দেখছি না- নিরুত্তাপ স্বরে গ্রিন বলল। আর ওটা হয়তো তোমার আস্তিনের বোতামের দাগ। গতরাতে উত্তেজনাবশত

ম্যারিয়টের ঠোঁট দুটো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে কথা বলার চেষ্টা করল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। অবশেষে সে তার বন্ধুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

মৃদু কম্পিত অনুচ্চ স্বরে সে বলল, দেখো, ঐ লাল দাগটা দেখছ? হাতের নিচের দিকে, যাকে তুমি আঁচড় বলছ?

এবার গ্রিন স্বীকার করল, কিছু যেন দেখেছে। ম্যারিয়ট রুমাল দিয়ে সেটা মুছে ফেলে আবার তাকে ভালো করে লক্ষ করতে বলল।

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে এটা একটা পুরোনো ঘায়ের দাগ।

এটা একটা পুরোনো ঘা! ফিসফিস করে ম্যারিয়ট বলল। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে থরথর করে। এখন সবকিছু মনে পড়ছে।

সবকিছু কী? চেয়ারে বসে অস্থির হয়ে গ্রিন জিজ্ঞেস করল।

চুপ! আস্তে! আমি তোমাকে বলব। এ ক্ষত ফিল্ডেরই কীর্তি!

বিস্মিত হয়ে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কারোর মুখে কোনো কথা নেই।

ঐ ক্ষত ফিল্ডেরই সৃষ্টি। অবশেষে ম্যারিয়ট একটু উঁচু গলায় পুনরাবৃত্তি করল।

ফিল্ড! তুমি বলছ-কাল রাতে?

না, কাল রাতে নয়–অনেক বছর আগে একটা ছুরি দিয়ে স্কুলে আমরা হাত কেটে একে অন্যের ক্ষতে রক্ত দিয়ে বদল করেছিলাম। সে এক ফোঁটা আমার হাতে ফেলেছিল, আমিও এক ফোঁটা তার–।

হায় ঈশ্বর, কিসের জন্য?

এটা একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন। আমরা পবিত্র অঙ্গীকার করেছিলাম, একটা চুক্তি। আমার এখন সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। আমরা ভূতের গল্পের বই পড়তাম এবং শপথ করেছিলাম যে আগে মারা যাবে সে অন্যকে দেখা দেবে। আমার পরিষ্কার মনে আছে, আজ থেকে সাত বছর আগে, এক ভীষণ গরমের। দুপুরবেলায় খেলার মাঠে কাজটা আমরা করি এবং একজন শিক্ষকের হাতে ধরা খাই। তিনি ছুরিটি কেড়ে নেন–

তাহলে তুমি বলতে চাইছ–গ্রিন তোতলাচ্ছে।

ম্যারিয়ট কোনো উত্তর দিল না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোফার ওপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। দুহাতে ঢাকল মুখ।

গ্রিন নিজেও একটু হতবাক। সে একা একা সমস্ত ব্যাপারটা আবার চিন্তা করতে লাগল। একটা ধারণা তার মাথায় এল, সে ম্যারিয়টের কাছে গিয়ে তাকে সোফা থেকে তুলল। আমি বলি কি ম্যারিয়ট, এতে এত ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। এটা অলীক কিছু হলে আমরা জানি কি করতে হবে। আর তা যদি না হয়, তবে আমরা বিষয়টিকে নিয়ে অন্যভাবে চিন্তা করতে পারি, তাই না?

ফ্যাকাসে মুখে গ্রিনের দিকে তাকিয়ে ম্যারিয়ট বলল, হয়তো তাই। কিন্তু আরেকটা কথা ভেবে আমি খুব ভয় পাচ্ছি। ঐ বেচারা আত্মা

ঐ লোকটা তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে-ব্যস, ব্যাপারটা মিটে গেল তাই না? ম্যারিয়ট মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

গ্রিন বলল, আচ্ছা, একটা জিনিস কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না, তুমি কি নিশ্চিত যে সত্যিই সে খাওয়াদাওয়া করেছিল?

ম্যারিয়ট কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকে দেখে জানাল এতে তার কোনো সন্দেহ নেই। সে শান্তভাবে কথা বলছিল। বলল, আমাদের খাওয়া শেষ হলে আমি নিজের হাতে সেগুলো সরিয়ে রেখেছি। ঐ আলমারির তৃতীয় তাকে পাত্রগুলো রাখা আছে। চেয়ারে বসেই ম্যারিয়ট দেখাল। গ্রিন উঠে গিয়ে পাত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখে মন্তব্য করল, যা ভেবেছি! এটা নিছকই মনের কল্পনা। খাবারগুলো কেউ ছোঁয়নি। এদিকে এসো, নিজের চোখে দেখে যাও।

তারা দুজনে তাকটা পরীক্ষা করে দেখল। বাদামি রঙের পাউরুটি পড়ে আছে, থালায় বাসি কেক, পাত্রে কমলালেবুর আচার যেমন রাখা হয়েছিল, তেমনি পড়ে রয়েছে, কেউ স্পর্শও করেনি। এমনকি ম্যারিয়টের গেলাসভর্তি মদও আগের মতোই রয়েছে।

গ্রিন বলল, তুমি কাউকে খাওয়াওনি, ফিল্ড কোনো খাবারও খায়নি, কিছু পানও করেনি। সে এখানে মোটেই ছিল না।

কিন্তু নিশ্বাস? চাপাগলায় ম্যারিয়ট জানতে চাইল।

গ্রিন উত্তর দিল না। সে ছোট শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ম্যারিয়টের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল। সে দরজা খুলে কান পেতে কী যেন শুনল। কথা বলার দরকার হলো না। গভীর নিশ্বাসের শব্দ অবিরাম ভেসে আসছে। ম্যারিয়ট যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সামনের পড়বার ঘরে-সেখানেও শুনতে পাচ্ছিল শব্দটা।

গ্রিন দরজা বন্ধ করে ফিরে এল। সে এই বলে ব্যাপারটার উপসংহার টানল, একটা কাজই করার আছে। বাড়িতে চিঠি লিখে ফিল্ড সম্বন্ধে তুমি জেনে নাও। আর এ কদিন আমার ঘরে থেকে তোমার পড়াশোনা চালিয়ে যাও। আমার আলাদা বিছানা আছে, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

বেশ রাজি আমি। এবার আমাকে পাশ করতেই হবে।

এ ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ম্যারিয়ট তার বোনের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেয়েছিল। চিঠির কিছু অংশ সে গ্রিনকে পড়ে শুনিয়েছিল, তার বোন লিখেছিল

...তুমি ফিল্ডের ব্যাপারে জানতে চেয়েছ। কিছুদিন আগে কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাকে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে কোথাও না গিয়ে বাড়ির বেসমেন্টে আশ্রয় নেয়। ধীরে ধীরে অনশন করে প্রাণত্যাগ করে। ...ওর বাড়ির লোকেরা ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের বাড়ির পরিচারিকার কাছে একথা শুনেছি, সে আবার তাদের দারোয়ানের মুখে শুনেছে। ১৪ তারিখে ফিল্ডের মৃতদেহ দেখতে পায় তারা। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেছে বারো ঘণ্টা আগে তার মৃত্যু ঘটেছে।... ভয়ংকর দেখাচ্ছিল ফিল্ডকে...।

গ্রিন ঢোক গিলে বলল, তাহলে সে ১৩ তারিখেই মারা গেছে?

ম্যারিয়ট বলল, হুঁ।

ঠিক ওই রাতে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল! ম্যারিয়ট আবার মাথা ঝাঁকাল।